ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

বাংলাদেশের কিশোর অপরাধ পরিস্থিতি ঃ মুন্সীগঞ্জ শহরের উপর একটি সমীক্ষা

গবেষক
ফারহানা মির্জা
রেজিঃ নম্বর : ৪৫২
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৮-২০০৯
সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

ফেব্রুয়ারি-২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের কিশোর অপরাধ পরিস্থিতি ঃ মুন্সীগঞ্জ শহরের উপর একটি সমীক্ষা

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
ফেব্রুয়ারি-২০১৪

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মো.নুরুল ইসলাম
অধ্যাপক
সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
ফারহানা মির্জা
রেজি: নম্বর : ৪৫২
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৮-২০০৯
সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ণ পত্র

আমি প্রত্যয়ণ করছি যে, ফারহানা মির্জা কর্তৃক এমফিল ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভ 'বাংলাদেশের কিশোর অপরাধ পরিস্থিতি ঃ মুন্সীগঞ্জ শহরের উপর একটি সমীক্ষা' টি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভটির তথ্য প্রাথমিক উৎস থেকে সংগৃহীত। আমি গবেষকের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

তারিখ :

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মো. নুরুল ইসলাম
অধ্যাপক
সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

জ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে উন্নত, উন্নয়নশীল উভয় বিশ্বেই সমাজকল্যাণ অধ্যয়ন ও গবেষণা কাজ এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় থেকে শুরু করে কলেজ পর্যায়ে সমাজকল্যাণ বিভাগের গবেষণা প্রতিবেদন পাঠ্য বিষয়ের পাশাপাশি গবেষণা একটি অন্যতম কোর্স হিসেবে স্বীকৃত হিসেবে দেওয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে আমার জানা মতে অনেক বিষয় নিয়েই গবেষণা হয়েছে। তবে কিশোর অপরাধ বিষয়টি নিয়ে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়নি ।

আমি আমার গবেষণা "বাংলাদেশের কিশোর অপরাধ পরিস্থিতি ঃ মুন্সীগঞ্জ শহরের উপর একটি সমীক্ষা" নিয়ে কিশোর অপরাধের কারণ এবং এর প্রতিকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আমি মনে করি আমার এ গবেষণা প্রতিবেদনটি কিশোর অপরাধের মাত্রা অনেকাংশে হ্রাস করতে সহায়তা করবে এবং সেই সাথে এই বিষয়টির প্রতি জনগণকে আরো সচেতন করে তুলবে ।

গবেষক

তারিখ :

ফারহানা মির্জা
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৮-২০০৯
রেজি: নম্বর : ৪৫২
সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"বাংলাদেশের কিশোর অপরাধ পরিস্থিতি ঃ মুন্সীগঞ্জ শহরের উপর একটি সমীক্ষা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনার প্রারম্ভে আমি সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি ।

যৌক্তিক কারনেই মানুষ একে অন্যের প্রতি কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ । এটাকে শ্বাশত বা চিরন্তণ রীতি বলা হয় । কৃতজ্ঞতাবোধ একটা অনুভূতি সঙ্গত ব্যাপার । একে লেখার মাধ্যমে উপস্থাপন করা বেশ দুস্কর । এ জটিল ও শ্রমসাধ্য গবেষণা কর্মটি শুরু থেকে চুড়ান্ত প্রতিবেদন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায় সুন্দর ও সাবলীল ভাবে সম্পাদনা করতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাদের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা অকৃত্রিম স্নেহ, আন্তরিক স্নেহ, আন্তরিক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান প্রজ্ঞা পূর্ণ অভিমত সুচিন্তিত উপদেশ ও পরামর্শ, ঐকান্তিক শ্রম এবং গঠনমূলক নির্দেশনা পেয়েছি তাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ ।

আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মো. নুরুল ইসলাম স্যারের প্রতি । কৃতজ্ঞতা শব্দটি ব্যবহার করে আমার অনুভূতি প্রকাশ নিতান্তই অনুপযুক্ত, অথচ এর বিকল্প কী শব্দ ব্যবহার করতে পারি তা আমার জানা নেই । আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. নুরুল ইসলাম স্যারের প্রতি এতটুকু বলতে পারি, অভিসন্দর্ভটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে তিনি যেভাবে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে অভিসন্দর্ভ সম্পাদনা করেছেন তা কেবল একজন পিতৃসুলভ কিংবা বড় ভাইসুলভ শিক্ষকের পক্ষেই সম্ভব । একটি ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ গবেষণা কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা, তথ্যাদি বিশে-ষণ করা এবং তার ফলাফল তৈরি করা একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে খুবই কঠিন কাজ । এর জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন দিক নির্দেশনা ,পরামর্শ, সাহায্য সহযোগিতা,সর্বোপরি তাত্ত্বিক জ্ঞান । বর্তমান অভিসন্দর্ভের পরিকল্পনা প্রণয়ন, রুপরেখা নির্মাণ, দিক নির্দেশনা, অনুসাঙ্গিক জটিলতা নিরসনে তাঁর সুচিন্তিত মতামত, প্রজ্ঞা বিবেচনা আমার গবেষণা কর্মকে সহজসাধ্য করেছে ।

আন্তরিক সহযোগিতা কার্যকরী উপদেশ পরামর্শ ও গঠনমূলক নির্দেশনা এবং উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে । বাংলাদেশের কিশোর অপরাধের কারণ এবং মুন্সীগঞ্জ শহরের উপর একটি সমীক্ষা- গবেষণা নিবন্ধনটি সে উদ্দেশ্যেই রচিত । আমাকে এমফিল গবেষণার জন্য এই শিরোনামটি অনুমোদন করে কৃতজ্ঞতার জালে আবদ্ধ করেছেন আমার তত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব ড. মো. নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, । তাছাড়া আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরন করছি, যে তিনি প্রশ্নপ্রত্র প্রনয়ন ,তথ্য বিশ্লেষণ ইত্যাদি সকল ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছেন । আমার এ গবেষণাটি রচনার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সক্রিয় সহযোগিতা করার জন্য তাকে আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনিস্টিটিউটে আমাকে এম. ফিল গবেষণা করার সুযোগ দেয়ায় আমি সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনিস্টিটিউটে বিশেষ করে তৎকালীন বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আব্দুস সামাদ স্যারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ।

আমি আমার একাডেমিক কমিটি, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক, এবং সকল শিক্ষকমন্ডলীকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি । পাশাপাশি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আমার

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণাটি অনুমোদন এবং পযোজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য । আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এ গবেষণার উত্তরদাতাদের যারা তাদের মূল্যবান সময় ব্যায় করে আমাকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেছেন । গবেষণা কর্ম সম্পাদনে যাদের গবেষণা বই, জার্নালের সাহায্য নিতে হয়েছে তাদের প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা । আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সামাজিক বিজ্ঞান,গবেষণা পরিষদ প্রভৃতি লাইব্রেরীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে যারা লাইব্রেরী ব্যবহারের অনুমতি দানসহ ব্যক্তিগতভাবে গবেষণা কর্মে তথ্য সরবরাহ ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করেছেন ।

এছাড়াও আমি আরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার বন্ধু সহ অন্যান্য যারা আমাকে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছে ।

গবেষক

ফারহানা মির্জা
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৮-২০০৯
রোল নম্বর : ০৪
রেজি: নম্বর : ৪৫২
সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় বিন্যাস

বর্তমান গবেষণা কর্মটিকে মোট নয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণার অধ্যায় বিন্যাস নিচে উল্লেখ করা হলো:

প্রথম অধ্যায় ০১-১৪

ভূমিকা

১.১ প্রারম্ভিক বক্তব্য ০১
১.২ গবেষণা সমস্যার বিবরণ ০৪
১.৩ মুন্সীগঞ্জে প্রবেশন অফিসারের তালিকাভূক্ত কিশোর অপরাধী ০৬
১.৪ গবেষণার বিষয় নির্বাচনের যৌক্তিকতা ০৭
১.৫ গবেষণার উদ্দেশ্য ১০
১.৬ প্রাক অনুমান/অনুমান গঠন ১০
১.৭ গবেষণা প্রত্যয়টির সংজ্ঞায়ন ১১
১.৮ গবেষনার পদ্ধতি ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৫-৩৮

কিশোর অপরাধ ঃ ধারণা, কারণ ও প্রতিকার

২.১ কিশোর অপরাধ ১৫
২.২ কিশোর অপরাধের ধারনা ১৬
২.৩ কিশোর অপরাধ প্রকৃতি ও স্বরূপ ১৭
২.৪ বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের কারণ ১৯
২.৫ কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে করণীয় ২৭

তৃতীয় অধ্যায় ৩৯-৪২

কিশোর অপরাধ সম্পর্কিত আইন ৩৯

চতুর্থ অধ্যায় ৪৩-৪৭

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র

৪.১ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র: কিশোর অপরাধ সংশোধনমূলক একটি প্রতিষ্ঠান ৪৩
৪.২ জাতীয় কিশোর অপরাধ সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের নানা সমস্যা ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় ৪৮-৫৮

সাহিত্য পর্যালোচনা ও সংবাদপত্রে কিশোর অপরাধ প্রসঙ্গ

৫.১. গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা ৪৮
৫.২. বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত কিশোর অপরাধ চিত্র ৫৩

ষষ্ঠ অধ্যায় ৫৯-৬২

কিশোরদের অপরাধের চিত্র

৬.১ অপরাধ জগতের কিশোরদের কয়েকটি চিত্র ৫৯
৬.২ সামাজিকীকরণের সমস্যায় অপরাধে জড়াচ্ছে কিশোর কিশোরীরা ৬২

সপ্তম অধ্যায় ৬৩-৯১

গবেষণার ফলাফল

অষ্টম অধ্যায় ৯২-১০০

কেস স্টাডি

কেস নং-১ ৯২
কেস নং-২ ৯৪
কেস নং-৩ ৯৭

নবম অধ্যায় ১০১-১১০

গবেষণার মূল ফলাফল, সীমাবদ্ধতা ও সুপারিশামালা

৯.১ গবেষণার মূল ফলাফল ১০১
৯.২.গবেষণার সীমাবদ্ধতা ১০৩
৯.৩. গবেষণার সুপারিশ ১০৫
৯.৪. উপসংহার ১১০

পরিশিষ্ট-১ : গ্রন্থপঞ্জি ১১১
পরিশিষ্ট -২ : প্রশ্নমালা ১১৫
পরিশিষ্ট-৩ : গবেষণা এলাকার মানচিত্র ১২০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ প্রারম্ভিক বক্তব্য
১.২ গবেষণা সমস্যার বিবরণ
১.৩ মুন্সীগঞ্জে প্রবেশন অফিসারের তালিকাভূক্ত কিশোর অপরাধী
১.৪ গবেষণার বিষয় নির্বাচনের যৌক্তিকতা
১.৫ গবেষণার উদ্দেশ্য
১.৬ প্রাক অনুমান/অনুমান গঠন
১.৭ গবেষণা প্রত্যয়টির সংজ্ঞায়ন
১.৮ গবেষনার পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.১ প্রারম্ভিক বক্তব্য

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত একটি দেশ। দেশের জনসাধারণ সীমিত সম্পদ এবং অভাবের মধ্যে বসবাস করে আসছে। এরই ফলশ্রুতিতে প্রতিনিয়ত বাড়ছে অপরাধ, তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কিশোর অপরাধ। সরকারি-বেসরকারিভাবে সংশোধন মূলক নানা কর্মসূচি পরিচালনা করেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ হচ্ছেনা, যা বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে। অপরাধের সাথে বয়সের সম্পর্কটি গুরুত্বপূর্ন। কেননা সমাজবিরোধী বা অপরাধ আইন বিরোধী যে কোন কাজই অপরাধ মুলক বলে বিবেচিত হলেও সব বয়সের বেলাই ঐ ধরনের কাজকে অপরাধমুলক হিসাবে গন্য করা হয় না। অর্থ্যাৎ বয়সভেদে "অপরাধমুলক কর্ম বিচার্য"।

কিশোর অপরাধ প্রবণতা সাম্প্রতিক কালের একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা। উন্নত দেশগুলিতে এ সমস্যা ব্যাপক আকারে ধারণ করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও শিল্পায়ন শহরায়নের সাথে সাথে এ সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। কিশোর অপরাধ একটি বৃহদাঙ্গিক প্রত্যয়। এর আওতাধীনে আসে বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের অসংখ্য কার্যকলাপ। ফলে কিশোর অপরাধ প্রত্যয়টি কিভাবে সজ্ঞায়িত করা যায় এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে রয়েছে নানা মত-পার্থক্য। ফলে আজ অবধি এর সার্বজনীন গ্রাহ্য কোন সংজ্ঞা গড়ে উঠেনি। তবুও সাধারণ অর্থে কিশোর অপরাধ বলতে বুঝায় কিছু সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ যা নির্দিষ্ট বয়স সীমার নীচে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত হয় এবং যা আইনত নিষিদ্ধ অথবা কোন আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ সৃষ্টি করে।

কিশোর অপরাধীদের আচরণকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক. অনুবর্তী (Conformist delinquent) অপরাধী; দুই. বেয়াড়া অপরাধী (Non conformist delinquent)। অনুবর্তী অপরাধী বলতে ঐ সব কিশোরদের বোঝানো হয়েছে যারা তাদের পরিবাসহ প্রাথমিক দলের রীতি-নীতি থেকে অপরাধমূলক আচরণের দীক্ষা লাভ করে। অপরপক্ষে, বেয়াড়া অপরাধীরা হচ্ছে ঐসব শিশু-কিশোর যারা তাদের প্রচলিত রীতি-নীতি মেনে চলা পরিবারসহ প্রাথমিক দলের পরিপন্থী আচরণ প্রদর্শন করে।

নিম্নশ্রেণীর ছেলেদের অপরাধমূলক কার্যকলাপে ধাবিত করার ক্ষেত্রে ছটি 'গুরুত্বপূর্ণ উপাদন' যেমন- trouble, toughness, smartness, excitement, fate ও antinomy-র সাথে নিম্নশ্রেণীর আবদ্ধতা অপরাধমূলক আচরণে উৎসাহ যোগায়। এর কারণ হচ্ছে নিম্নশ্রেণীর শিশু অন্যান্য শিশুর সঙ্গে সংহতি সৃষ্টি করে মর্যাদা অর্জনে ব্যাপৃত হয়। আবার মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে toughness-এর তুলনায় Finesse ও Sophistication-কে অধিক মূল্য দেওয়া হয়। সঙ্গদল ও তরুণ-সংস্কৃতি মধ্যবিত্ত শিশু কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা দান বাঁধার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে।

পিতা-মাতার বৈবাহিক সম্প্রীতি ও শিশুদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এ দুয়ের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কোনরূপ প্রত্যাখানের অনুভূতি অথবা নিরাপত্তার অভাব, ভুল বোঝাবুঝির শিকার, পারিবারিক সম্প্রীতির

অভাব বা ভাই-বোনদের মধ্যে ঈর্ষার কারণে অশান্তিবোধ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়কে আবেগজনিত বঞ্চনার করাণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পরিবারে Unwish Discipline- যেমন কখনো কঠোর, কখনো বা অতি আহ্লাদ অথবা এ দুয়ের মধ্যে উঠানামা করা ইত্যাদি আরেকটি দিক যা কিশোর অপরাধের সঙ্গে যুক্ত করা চলে কারণ শিশুর বিকাশে এরূপ অবস্থা খুবই ক্ষতিকর।

কাঠামোগতভাবে ভগ্ন পরিবার সংহতি স্বাভাবিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। অতএব, ঐ পরিবার নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় দুর্বল হয়ে পড়বে। কাঠামোগতভাবে পরিবার ঠিকই আছে; কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক ভাবে বাবা-মার মধ্যে রয়েছে দারুণ ফারাক। এ অবস্থায় পারিবারিক সংহতি দূর্বল থাকবে। পরিবার যে অবস্থায়-ই বিরাজ করুক না কেন শিশুর বিকাশে বাব-মার দৃষ্টিভঙ্গি অতি গুরুত্বপূর্ণ।

ভাঙ্গন পরিবারও কিশোর অপরাধের মধ্যে সর্ম্পক রয়েছে। অর্ধেকেরও বেশী কিশোর অপরাধী পিতা বা মাতা অথবা যে কোন একজনের কাছে থাকে তাদের ক্ষেত্রে শতকরা ৬০.৬ ভাগ কিশোর অপরাধের শিকার এবং শতকরা ৩৪.২ ভাগ কিশোর অপরাধী নয় যাদের সকলেরই শৈশবকালে ভাঙ্গন পরিবারের অভিজ্ঞতা আছে। শিশুদের নিয়ন্ত্রণে পিতা-মাতার অসংগতিপূর্ণ আচরণ বিরূপ প্রভাব ফেলে। পূর্ণ বয়সী শিশুদের তুলনায় অল্প বয়সী শিশু যাদের বয়স ৩-৬ বছরের মধ্যে তারা ভাঙ্গন পরিবারের মাধ্যমে অপরাধমূলক আচরণে বেশি প্রভাবিত হয়। অপরিমিত শাস্তির প্রকৃতি কিশোর অপরাধের উপাদান হিসেবে কাজ করে। পিতা-মাতার অসহযোগিতামূলক মনোভাব সন্তানদের আক্রমণাত্মক করে তুলে যা কিশোর অপরাধের জন্ম দেয়।

কোন সমাজে খুব অল্প সংখ্যক অভিভাবক আশা করতে পারেন তাদের সন্তান ১০০ ভাগ অনুগত থাকবে, সর্বদাই প্রত্যাশিত আচরণ করবে। প্রতিটি শিশুর মাঝে কম-বেশি অপরাধের প্রতি একটু ঝোঁক আছে যার পরিপূরণ অনেকটা সামাজিক নিয়ম-কানুন বাধাগ্রস্থ করে তোলে। শিশুর জীবনে তার পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। সামাজিক পরিবেশ তাকে প্রভাবিত করে। তবে পরিবারের প্রভাবই শিশু মানসে গভীরভাবে দাগ কাটে। সাধরণত দুই তিন বছরের শিশুরা পরস্পর পরস্পরের সাথে মিশতে শুর করে এবং সামাজিক সম্পর্কের সুত্রপাত হয়। শিশুর এই সামাজিক সম্পর্ক খেলতে গিয়ে শুর হয়। ক্রমান্বয়ে সমান্তরাল খেলা (Parallel Play) ও সম্মিলিতভাবে খেলা (Associative Play)-র মাধ্যমে তার সামাজিক অভিযোজন এগিয়ে চলে। বংশগতি, পরিবেশ ও Response- এর ত্রিবিধ উপাদানে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শিশুর আচরণে ধীরে ধীরে পরিপক্কতা আসে।

বিভিন্ন মনীষীগণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কিশোর অপরাধীকে বিশ্লেষণ করেছেন। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কিশোর অপরাধীকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, একজন কিশোর সামাজিক পরিবেশে খা খাওয়াতে না পারায় সে নানারকম অসামাজিক আচরণ করে থাকে যা অপরাধমূলক কার্যক্রমের আওতাভূক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। এরিক এরিকসন তাঁর মনো সামাজিক বিকাশ তত্ত্বে বলেছেন, "মানুষ তার পরিবেশের উৎপন্নজাত (Man is the bye product of his environment)। মানুষ জন্ম থেকে শুর করে মৃত্যু পর্যন্ত কোন না কোন পরিবেশে অবস্থান করে। পরিবেশই তাকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক শিক্ষা প্রদান করে থাকে। তিনি (এরিকসন) তার বিকাশ তত্ত্বে (Psychonanalysis Theory of Personality) দেখিয়েছেন। কিশোর বয়সে যদি কোন কিশোরের মনো-সামাজিক চাহিদা পূরণ না হয় পরবর্তীতে সে (কিশোর) নেতিবাচক ব্যক্তিত্বের অধিকারী

হবে যা তাকে অপরাধী করে তুলবে। তিনি তার তত্ত্বে এটাও দেখিয়েছেন কিশোর বয়সে সে বন্ধু-বান্ধব, খেলার সাথী, সহপাঠীদের সাথে সঠিকভাবে মিশতে না পারে তাহলে সে নিজের ভেতরে নিজেকে গুটিয়ে নেয় ফলশ্রুতিতে নানারকম অসামাজিক (Anti-social) কার্যকলাপের সাথে সাথে যুক্ত হয়ে থাকে।

সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোন থেকে ঐ কিশোরকেই অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করা হয় যে তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ গ্রহণ করা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী আচরণ করে এবং অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে। সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ন এর সাংস্কৃতিক শূণ্যতা তত্ত্ব অনুযায়ী "The stain that co-exists change at unequal rates of speed" অর্থাৎ সংস্কৃতির পরস্পর সম্পর্কিত দুটি অংশেরা মাধে যে টানপোড়ন বিদ্যমান তার মূলে রয়েছে অংশ দুটির অসব গতিসম্পন্ন পরিবর্তন। কিশোর অপরাধের বিচার কার্য একটি সংবেদনশীল বিষয়। কিশোর অপরাধীরা বয়সে তরুণ এবং অপরাধ জগতে নবীন। তাদের কৃত অপরাধের পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। পরিবেশ ও পরিস্থিতিগত অনেক জটিল বিষয় রয়েছে যা হতে তরুণ বয়সের এবং স্বল্প জ্ঞান সম্পন্ন শিশু-কিশোররা বেরিয়ে আসতে পারে না। ফলশ্রুতিতে তার সংঘটিত করছে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ। তাদের বিচার কার্য পরিচালনায় স্বভাবতঃই নমনীয় হওয়ার এবং "শাস্তি নয়-সংশোধন" বিশ্বব্যাপী গৃহীত এ নীতি বাস্তবায়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

শিশু-কিশোর অপরাধের বিচারকার্য পরিচালনায় এবং এতদসংক্রান্ত রায় ঘোষণার সময় সংশ্লিষ্ট শিশু-কিশোরদের ভবিষ্যৎ সুন্দর ও সাবলীল জীবন, অধিকার সংরক্ষণ, সার্বিক কল্যাণ ও মানবিক বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা হয় এবং সে লক্ষ্যে তাকে শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে সংশোধনের সুযোগ দেয়য়া হয়। আধুনিক চিন্তাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, অপরাধ বিজ্ঞানী, আইন বিশেষজ্ঞ ও শিশু-কিশোর অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে সংওশাধনের সুযোগ দানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন। জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদেও অপরাধে জড়িত শিশুদের কল্যাণ, স্বার্থ রক্ষা ও অধিকার সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বালাদেশেও এ নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে সাধারণত ৭-১৬ বছরের কিশোর কিশোরীদের কিশোর অপরাধী বলে গণ্য করা হয় । যখন কোন কিশোর বা কিশোরী সমাজ বা আইন বিরোধী কোন কার্যাবলী করে থাকে তখন তাকে কিশোর অপরাধ বলে।

মানবিক জীবনে কৈশোর কালটি নানা প্রতিকূল প্রতিবন্ধকতার মাঝ দিয়ে পার হয়। স্কুল পেরুনো বয়সটাই হোলো উড়ু উড়ু চঞ্চল। বাধা না মানার বয়স। এ বয়সে বন্ধু খুঁজতে থাকে সে। পেয়েও যায়। বন্ধুকে ঘিরে যা সত্য না তাও ভাবতে থাকে। কখনও সে মধুর স্বপ্নে আনন্দে বিভোর থাকে। আবার কখনও বিভিন্ন জটিল সমস্যার কারণে বিষন্নতায় ভোগে। এ ক্রান্তি লগ্নে তার মাঝে এসে ভর করে অস্থিরতা, রোমান্টিসিজম, অ্যাডভারটারিজম ও হিরোইজম। এ সব চিন্তার মাঝে যেমন আছে ভালো লাগা তেমনই আছে নীরব পতনের পদধ্বনি।

সংক্ষেপে যে সমস্ত কাজ প্রাপ্ত বয়স্কদের দ্বারা সংঘটিত হলে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় সে ধরনের প্রচলিত আইন ভঙ্গকারী কাজ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত হলে সেটিকে কিশোর অপরাধ বলা হয়। অন্য কথায়, অসদাচরণ অথবা অপরাধের কারণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা বিচারালয়ে আনীত কিশোরকে কিশোর অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে বলা হয়

যে, আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত কিশোররাই হচ্ছে কিশোর অপরাধী। কিন্তু আদালতের অপরাধ নিরূপণ পদ্ধতি ও রায় দেশ ও সমাজ ভেদে বিভিন্ন ধরনের হয়। তাই বলা যেতে পারে যে, কোনো কিশোর অপরাধী কি না তা নির্ভর করে তার মাতাপিতা, প্রতিবেশী সমাজ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সর্বোপরি আদালতের বিচারকের মনোভাবের ওপর।

অপরাধ ও অপরাধীদের বিচার সম্পর্কিত ১৯৫০ সালের আগস্টে লন্ডনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত এক সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, শিশু বা অপ্রাপ্ত বয়স্কদের দ্বারা সংঘটিত যে সব আচরণ অসংগতিপূর্ণ বা আইনভঙ্গমূলক অর্থাৎ যা সমাজিকভাবে বাঞ্ছিত বা স্বীকৃত নয় তা সবই কিশোর অপরাধের অন্তর্ভূক্ত। অন্যদিকে আমেরিকান চিল্ড্রেন ব্যুরো কিশোর অপরাধের সংজ্ঞায় উল্লেখ করেছে যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক বা কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত রাষ্ট্রিক আইন বা পৌর বিধি বিরোধী সব কাজই কিশোর অপরাধের আওতাভুক্ত। উপরন্তু, সমাজ সদস্যদের অধিকারে আঘাত করে এবং কিশোরদের নিজের ও সমাজের কল্যাণের পথে হুমকি স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত এমন যে কোনো মারাত্মক সমাজবিরোধী কাজও কিশোর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত।

১.২ গবেষণা সমস্যার বিবরণ

দ্রুত শহরায়ন, শিল্পায়ন ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের সাথে কিশোর অপরাধীদের সংখ্যা প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোর মত কিশোর অপরাধ ভয়াবহ আকার ধারণ না করলেও বাংলাদেশে এ অপরাধ বৃদ্ধির প্রবণতা উদ্বেগজনক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। দেশের সাধারণ কিশোররা ক্রমেই জড়িয়ে পড়ছে চুরি, ডাকাতি, খুন এমনকি ধর্ষণের মত জঘন্য অপরাধে। সেই সাথে জড়িয়ে পড়ছে নেশার অন্ধকার জগতে। সেখান থেকে ক্রমেই সে যুক্ত হয়ে পড়ছে নানা অপরাধে। অনেক ক্ষেত্রে অপরাধের শাস্তি দিতে গিয়ে অপরাধীর বয়স এবং সামাজিক অবস্থান দেখে হতবাক হয়ে যাচ্ছেন বিচারকগণ। কোন কোন অপরাধ বিশেষজ্ঞ মনে করেন কিশোর অপরাধ মূলত শহুরে সমস্যা।

অপরদিকে কিশোরীদের চেয়ে কিশোররাই বেশি অপরাধ করে। শহরে বস্তির ভবঘুরে শিশুরা বিভিন্নভাবে অপরাধে জড়িত হয়ে পড়ে। এদের দুঃসহ জীবন এদেরকে অপরাধী করে তোলে। বাংলাদেশের শহর এলাকার মধ্যে রাজধানী ঢাকার শহুরে জীবনের চিত্র ভয়ঙ্কর। রাস্তায় জন্ম রাস্তায় বড় হওয়া শিশুরা সবকিছু এখানেই রপ্ত করে। এরা চলতে শিখলেই ছোট ছোট চুরি করে। একটু বড় ও সাহস হলেই, স্ট্রিটলাইট, ম্যানহোল, ইট রডের টুকরো চুরি করে। পরবর্তীতে পরিবেশ পরিস্থিতি এদেরকে মাদক দ্রব্যের প্রতি আসক্ত করে। কখনো এরা পরিনত হয় রাজনৈতিক দলের 'টোকাই' বাহিনী যা হয়ে উঠে হরতাল তথা দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নের হাতিয়ার। অপরদিকে ছিন্নমূল কিশোরীরা নেমে পড়েছে পতিতাবৃত্তিতে। এত গেল বিত্তহীনদের কথা। বিত্তবানদের শিশুরা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। নষ্ট হচ্ছে ঘুষখোর, মদ্যপ, জুয়াড়ি, পিতামাতার অযত্ন, অবহেলা, বিত্তবৈভবের প্রাচুর্য, ড্রাগ, ডিশ এন্টেনার অনুপ্রবেশ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অপপ্রয়োগ, ধর্মীয় অনুশাসনের অভাব ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ঠেলে দিচ্ছে চরম অপরাধের দিকে।

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অপরাধ বিশেষজ্ঞদের মতে শিশু কিশোরদের অপরাধ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার্স কল্যাণ সমিতির গবেষণায় দেখা গেছে ২০০০ সাল থেকে ২০১১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ২ হাজার ৪৭ জন কিশোরকে

অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়া সন্দেহ, ভবঘুরে ইত্যাদি কারণে প্রায় ২ শত শিশু কিশোরকে গ্রেফতার করা হয়। ৫৮৫ জনকে চুরি ও পকেটমারের জন্য ৯৩ জনকে ডাকাতির জন্য এবং অস্ত্র ও বিস্ফোরক রাখা ও ব্যবহারের জন্য ৫৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। (তথ্যসূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব)

অবসরপ্রাপ্ত বাংলাদেশ পুলিশ অফিসার্স কল্যাণ সমিতির গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে কিশোর অপরাধীদের যে পরিসংখ্যান দেখিয়েছে তা হলো- ২০০২ সালে ৪৪ জন, ২০০৩ সালে ১৮০ জন, ২০০৪ সালে ১৩৭ জন, ২০০৫ সালে ১১৩ সালে, ২০০৬ সালে ২১৪ জন, ২০০৭ সালে ৩২৯ জন, ২০০৮ সালে ৪৯৫ জন, ২০০৯ সালে ৪৩৯ জন, ২০১০ সালে ৫২৬ জন, ২০১১ সালে ৬৮৫ জন, ২০১২ সালে ৭৭১ জন কিশোর অপরাধীর তালিকা প্রকাশ করে। (তথ্যসূত্র : কিশোর অপরাধ সংশোধনী বুকলেট, ২০১২)

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি পৃথক হওয়ার কারণে অপরাধের ধরণও ভিন্ন হয়ে থাকে। পাশ্চাত্য সমাজে প্রকাশ্য মদ্যপান করা অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। কিন্তু বাংলাদেশের সমাজে এ ধরণের আচরণ প্রদর্শনকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। তেমনি কোন বয়স থেকে কিশোরদের অপরাধী বলা হবে সে নিয়ে রয়েছে মতভেদ। নিম্নে বিভিন্ন দেশের অপরাধী হিসেবে কোন বয়সী কিশোরদের সনাক্ত করা হয় তা বর্ণনা করা হল ঃ

- ভারত,মায়ানমার ও সিংহলে ৭ বৎসরের কম বয়সী শিশু অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হয় না।
- জাপানে ১৪ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদের কার্যাবলী শাস্তিযোগ্য নয়।
- ফিলিপাইনে ৯ বৎসরের কম বয়স্ক শিশু অপরাধমূলক কাজ হতে মুক্ত।
- থাইল্যান্ডে ৭ বৎসরের কম বয়স্ক শিশু অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হয় না।
- বাংলাদেশে ৭ বৎসরের শিশুদের অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হয় না।

বর্তমানে বাংলাদেশে যাদেরকে কিশোর অপরাধী বলা যায় তাদেরকে আইনের ভিত্তিতে পৃথক করা হয়েছে সাধারণ অপরাধী থেকে। ১৯৭৪ সালের শিশু আইন অনুযায়ী (২ ধারা) শিশু বলতে ১৬ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের বুঝায় এবং এ বয়সী ছেলেমেয়ে কর্তৃক সংঘটিত আইন বিরুদ্ধ কাজ কিশোর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। অপরদিকে জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে সকল মানুষ শিশু হিসেবে গণ্য হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ মুন্সীগঞ্জে প্রবেশন অফিসারের তালিকাভূক্ত কিশোর অপরাধী -

মুন্সীগঞ্জ জেলায় সর্বমোট ১১ জন কিশোর অপরাধী প্রবেশনের সুযোগ পেয়েছে। এর মধ্যে ২০১৩ সালে ৪জন। ২০০৭ সাল থেকে প্রবেশন চালু হলেও ২০১০ সালে প্রথম প্রবেশনের সুযোগ পায় মুন্সগঞ্জ শহরের খালইস্ট বাসিন্দা সাগর আহম্মেদ রনি।

১. ২০১০ সালে প্রথম প্রবেশনের সুযোগ পায় মুন্সীগঞ্জ শহরের খালইস্ট বাসিন্দা সাগর আহম্মেদ রনি (১৪)। মুন্সীগঞ্জ থানার মামলা নং ৮(৬)১০। ছিনতাই মামলায় রনিকে মুন্সীগঞ্জ আদালত ৩ বছরের প্রবেশনে দেয়। ২০১৩ সালের ২১ অক্টোবর তার প্রবেশন শেষ হলে মামলা থেকে নিস্কৃতি পায়।

২. একই মামলায় আসামী ছিল শহরের খালইস্ট বাসিন্দা মো. হাসান মিয়া(১৩)। তবে মামলাটিতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় আদালত তাকে অব্যাহতি দেয় গত ২০১০ সালের ২১ অক্টোবর ।

৩. সদর উপজেলার রিকাবীবাজারের শাহজাহান মিয়ার পুত্র আ. রহিম (১৪) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ২০০৩ এর ১০ ধারায় অভিযুক্ত হয়ে গ্রেফতার হয়। মুন্সীগঞ্জ থানার মামলা নং ২৬(২)১৩। অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তান আ. রহিম স্কুলগামী ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করতো। এক ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরা তাকে মারধর করে পুলিশে সোপর্দ করে এই মামলা দায়ের করে। পরে প্রবেশন কর্মকর্তা বাদীর সাথে যোগাযোগ করে সমঝোতার মাধ্যমে মুন্সীগঞ্জ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের মাধ্যমে মুক্তি পায়। একই সাথে মামলাটি নথিজাত করা হয়।

৪. চুরি মামলায় গ্রেফতার হয় শ্রীনগর উপজেলার বালাসুর গ্রামের লতিফ মাদবরের পুত্র মো. সোহেল (১৫)। শ্রীনগর থানার মামলা নং ২৭(৮)১৩। পরবর্তীতে ২০১৩ সালের ৮ আগস্ট এই কিশোর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থেকে মুক্তি পায় এবং মামলাটি নিস্পত্তি হয়।

৫. পিয়া আক্তার (১৬) নামের এক কিশোরীকে সন্দেহজনকভাবে গ্রেফতার করে পুলিশ। সিরাজদিখান থানার জিপি নং ৩৮০, তাং ১০ আগস্ট ২০১৩। এই কিশোরী এতটাই মানুষিকভাবে বিপর্যস্ত যে সে নিজের না 'পিয়া' ছাড়া আর কিছুই বলতে পারছে না। ফেল ফের করে কাঁদে। এই কিশোরী পাগল বা প্রতিবন্দি না হওয়ায় সত্ত্বে আর কোন কথা বলতে না পারার পেছনের কারণ বের করতে পারেনি পুলিশ। দেখে সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান বলেই মনে হয়। কিন্তু কিশোরীর পরিচয়ও সনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ। পরে মুন্সীগঞ্জ জুডিয়াল ম্যাাজিস্ট্রেট প্রবেশন কর্মকর্তার মাধ্যমে কিশোরীকে গাজীপুরের কোনাবাড়িতে সে নিরাপদ হেফাজতে পাঠিয়েছে। এই কিশোরী সুস্থ হলে পরিচয় পাওয়া গেলে প্রবেশন কর্মকর্তা আদালতকে অবগত করলে পরবর্তী পদক্ষে গ্রহন করবে।

৬. সম বয়সী এক বন্দুকে হত্যা করার দায়ে অভিযুক্ত আল আমিন (১৫) এখন গাজীপুরের টঙ্গীর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে রয়েছে। টঙ্গীবাড়ি উপজেলার উত্তর শিমুলিয়া গ্রামের মুজিবুর রহমানের পুত্র আল আমিন গ্রেফতার হয় ১২ জুলাই ২০১২। টঙ্গীবাড়ি থানার মামলা নং ৪(৬(১২। মামলাটি মুন্সীগঞ্জের জেলা ও দায়রা জজ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

৭. মিরাজদিখান উপজেলার বয়রাগাদি গ্রামের মৃত মো শাহিন মিয়ার পুত্র হৃদয় মিয়া (১৩) নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার আসামী এখন জামিনে মুক্ত আছে। সিরাজদিখান থানার মামলা নং ২৬(১)১৩। গত মে মাসে সে জামিনে মুক্তি পেলেও মামলাটি মুন্সীগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৮. মো. ছিনবাদ আকন্দ (১৫) হত্যা মামলায় গ্রেফতার হয়ে এখন মুন্সীগঞ্জ কারাগারের রয়েছে। টঙ্গীবাড়ি উপজেলার পুরাবাজারের আবু তাহের আকন্দের পুত্র ছিনবাদ সমবয়সী বন্ধুকে হত্যার দায়ের গ্রেফতার হয়। টঙ্গীবাড়ি থানার মামলা নং ২৩(১০)১২। এই কিশোরকে প্রথমে টঙ্গীর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে রাখা হলেও বিচারের জন্য মুন্সীগঞ্জ আদালতে আনার নেয়ার সম্যার কারণে গত নবেম্বর থেকে মুন্সীগঞ্জ জেলখানায় রাখা হয়। মামলাটি মুন্সীগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

৯. বৃষ্টি রানী পাল (১৫) সিরাজদিখান থানার ১(৪)১৩ মামলায় গ্রেফতার হয়ে প্রবেশন কর্মকর্তার মাধ্যমে গাজীপুরের টঙ্গীর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে রয়েছে। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলের সাথে প্রেম করে পালিয়ে যাওয়ার পর বৃষ্টি বাবা মামলা করলে পুলিশ গ্রেফতার করে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯(১) ধারার এই মামলাটি মুন্সীগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

১০. গজারিয়া থানার ৪(২)১২ নং ডাকাতি মামলায় মো. এনামূল (১৫) গ্রেফতার হয়। সে শেরপুর জেলার নলিতাবাড়ি উপজেলার চাঁদগাঁও গ্রামের মর্জিনা বেগম ও মো. ফজল শেখের পুত্র। পরবর্তীতে হাইকোর্ট থেকে এই কিশোর মুক্তি পায়।

১১. মুন্সীগঞ্জ থানার ৫৯(৮)১২ নং ধর্ষণ মামলায় গ্রেফতারের পর হাসান শেখ (১২) প্রবেশনে রয়েছে ৭ অক্টোবর ২০১২ থেকে। হাসান সদর উপজেলার উত্তর মহাকালী গ্রামের রাজা মিয়ার পুত্র। সে নবম শ্রেণির ছাত্র। প্রতিবেশী ফুফুতো বোনেকে ধর্ষনের অভিযোগে দায়ের করা মালাটি মুন্সীগঞ্জ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

১.৪ গবেষণার বিষয় নির্বাচনের যৌক্তিকতা

তরুনরাই আমাদের ভবিষ্যত, দেশের মূল চালিকাশক্তি। কিশোর বয়সেই শিশুর নৈতিক,চারিত্রিক বিকাশ ঘটে। এ সময় যদি তার নৈতিক, চারিত্রিক বিকাশ যথাযথ না হয় তাহলে সে বেপোরোয়া হয়ে উঠবে। যা জাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবে। নানা প্রতিকূলতায় বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত কিশোর অপরাধীর সংখা বাড়ছে। অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষন, যুদ্ধ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দারিদ্র্য প্রভৃতি কারনে এদেশে কিশোর অপরাধীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এখনই যদি এ সমস্যার সমাধান করা না যায় তাহলে দেশ ধ্বংসের দাড় প্রান্তে পৌঁছে যাবে।

দেশে শিশু-কিশোর অপরাধীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিজের অজান্তেই নানা উপায়ে এবং নানান কারণে তারা জড়িয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডে। যে বয়সে একজন কিশোররের স্কুলে যাবার কথঅ, খেলাধূলা করার কথা, সে বয়সে তারা বন্দী জীবন কাটাচ্ছে কারাগারের অন্ধকারে। এখানে শিশুরা বয়স্ক অপরাধীদের সাথে অবাধে মেলামেশায় সুযোগ পাচ্ছে বিধায় তারা পাকা অপরাধীতে পরিণত হয়, তার মাদকাসক্ত হয় এবং দৈহিক নির্যাতনের শিকার হয়।

পরিবার ভাঙ্গছে উন্নত সবদেশে, ভাঙ্গছে শিশুর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। ধনী দেশগুলোর প্রাচুর্যের বিপরীতে বাংলাদেশের মত উননয়নশীল দেশে দারিদ্র শিশু কিশোরদের দুঃসহ অবস্থার মূল কারণ। রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে জীবনের চিত্র খুবই ভয়াবহ। নিম্ন বিত্ত পরিবার গুলোতে নান রকম সমস্যা, অভাব-

Dhaka University Institutional Repository

অনটনের মধ্যে থেকেই অনেক শিশু-কিশোররা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। অনেক শিশুর রাস্তার জন্ম, রাস্তায় বড় হওয়া আবার রাস্তাতে অনেক শিশুর ঠিকান। এরা একটু বড় হতে না হতেই ছোট ছোট চুরি করে হাত পাকায়। (বিত্তবানদের চেহার আবার ভিন্ন। পিতামাতায় অযত্ন, অত্যাচার, অবহেলা, স্নেহহীনতা, বিত্তবৈভবের প্রাচুর্য, ধর্মীয় অনুশাসনের অভাব, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রভৃতির প্রভাবে শিশু-কিশোরদের মধ্যে বাড়ছে হতাশা। এছাড়াও রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে ছিন্নমূল শিশু-কিশোররা অপরাধ জগতের সাথে পরিচিত হচ্ছে নিত্য দিন। এভাবেই নষ্ট হচ্ছে কোমল মতি শিশুরা)।

পিতামাতার অবহেলা, দারিদ্র, কুশিক্ষা এর মূল কারণ বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। উন্নত দেশগুলোতে এর জন্য বন্ধনহীন সামাজিক ব্যবস্থঅকে দায়ী করা হয়। বাংলাদেশে গরীব মধ্যবিত্ত ঘরে এ সংখ্যঅ বাড়ছে। হঠাৎ ধনী হওয়া কিছু সংখ্যক পরিবারেও কিশোর অপরাধীর হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ধরণের পরিবারে কিশোর অপরাধীর হার বৃদ্ধির মূল কারণ মা-বাবার শৃঙ্খলতার অভাব এবং সন্তানের প্রতি সুষ্ঠু নজরদারী না করা। পাশ্চাত্য শিক্ষাও অন্যতম কারণ। ঢাকা মহানগরীতে অনেক অভিজাত পরিবারেই এ ধরণের কিশোর অপরাধী রয়েছৈ। মা-বাবার দেখাশুনার অভাবে অনেক কিশোর মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। নেশার টাকা যোগাড় করতে না পেড়ে অপরাধের আশ্রয় নিচ্ছে। ছিনতাই রাহাজানিসহ বিভিন্ন ধরণের অপরাধ করছে। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ছে পুলিশ অথবা আত্মীয় স্বজনের হাতে। চক্ষু লজ্জার ভয়ে অনেক অভিভাবক তার সন্তানকে বিদেশ পাঠিয়ে দিছেন, আবার কেউ কেউ কিশোর সংশোধনী কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

কিশোর অপরাধ বলতে একসময় অন্যের গাছের ফল চুরি, খেলাধুলা করতে গিয়ে সমবয়সী অন্য কারো সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়া বা মারামারি করা, শিক্ষক বা অভিভাবকদের আদেশ-নিষেধ অমান্য করা, স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখা- এসবকে বোঝাত। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে কিশোর অপরাধের সে সংজ্ঞা দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এতটাই চরমে, এখন অনেক কিশোরও জড়িয়ে পড়ছে লোমহর্ষক সব অপরাধের সঙ্গে। জড়িয়ে পড়ছে মাদকের নেশা, মাদক ব্যবসা, চোরাকারবার, এমনকি খুন ও ধর্ষণের মতো ঘটনার সঙ্গে। বিদেশি চলচ্চিত্র, ইন্টারনেটসহ নানা কারণ এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এসব অপরাধপ্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে। এ নিয়ে একদিকে যেমন অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন, তেমনি সামাজিক বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি হচ্ছে। দারিদ্র্য, কাঁচা টাকার লোভ দেখিয়ে শীর্ষ সন্ত্রাসীরা কিশোরদের মাঠে নামাচ্ছে। শীর্ষ সন্ত্রাসীরা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর টার্গেট থাকায় স্বাভাবিকভাবে তাদের স্বাভাবিক বিচরণ করা কঠিন। তাই স্কুল-কলেজপড়ুয়া কিশোরদের টার্গেট করে অপরাধীরা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যেসব কিশোর অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে, তারা অনেকেই তাদের শাস্তির বিষয়ে জানে না। অভিভাবকরা জানেন, তাদের ছেলেরা নিয়মিত স্কুল-কলেজে যাচ্ছে। অংশ নিচ্ছে ক্লাস-পরীক্ষায়। কিন্তু তাদের সন্তানরা তাদের অগোচরেই জড়িয়ে পড়ছে ভয়ঙ্কর সব অপরাধে।

র‍্যাব সূত্রে জানা যায়, শীর্ষ সন্ত্রাসীরা কিশোর অপরাধীদের চার ভাগে ভাগ করে অপরাধে জড়াচ্ছে। কিশোর অপরাধীদের কেউ কেউ কেবল অস্ত্র ব্যবসা করে। কারো পরিচয় শুটার হিসেবে। কেউ অস্ত্র বহন ও বিক্রি দুটিই করে। আবার কোনো কোনো কিশোর শুধু অস্ত্র বহনের কাজে জড়িত। অল্প বয়সে কাঁচা টাকার লোভ দেখিয়ে দাগী সন্ত্রাসীরা তাদের দলে ভেড়ায়। অনেকে আবার বখাটে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে অপরাধ জগতে পা রাখে।

সারা দেশে শিশু-কিশোর অপরাধীর সংখ্যা বাড়ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এর মতে ঢাকায় গত বার বছরে কিশেঅর অপরাধীর সংখ্যা বেড়েছে বার গুণ। (আজকের কাগজ, ৩রা এপ্রিল ২০০৫)। পুলিশের দেওয়া তথ্যমতে ঢাকায় গ্রেফতাকৃতদের বিশ শতাংশই বয়সের দিক থেকে ১৬ বছরের নীচে। (দৈনিক ইত্তেফাক ২১ জুলাই, ২০০৫)। মুন্সীগঞ্জ সদর থানার ওসি শহদিুল ইসলাম জানান মাদকে গ্রেফতারকৃতদের ২৫ শতাংশই কিশোর। কিশোর অপরাধ বৃদ্ধি এবং তার ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে প্রণীত হয় বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪ (The Children Act. 1974)। এই আইনের প্রায় অধিকাংশ নিয়মাবলী বিধি ব্যবস্থা উন্নত এবং প্রগতিশীল দেশের আইনের সাথে সমকক্ষতা দাবী করতে পারে। কিন্তু সরার দেশে শিশুদের জন্য রিমান্ড হোম (Remand Home)। শিশু আদালত (Juvenile Court), এবং শিশু সংশোধন কেন্দ্র (Correction Center) এই তিন ধারায় সমষ্টি গত একটি প্রতিষ্ঠান আজ (১৯৭৮ সনে প্রতিষ্ঠিত) ৩০ বছর ধরে টঙ্গীতে অবস্থিত আছে। সারা দেশে যেখানে ১২/১৩ হাজার শিশু অপরাধী গ্রেফতার হচ্ছে, সেখানে সর্ব সাকুল্যে "অনধিক ২০০ জন শুধুমাত্র ছেলে রাখার ব্যবস্থা টঙ্গীতে, গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে ১৫০ জন কিশোরী মেয়ে এবং যশোর পুলের হাট সংশোধনী কেন্দ্রে ১৫০ জন ছেলে রাখার ব্যবস্থা আছে" (সমাজ সেবা অধিদপ্তর)।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এই একটি দুটি প্রতিষ্ঠানে সীমিত সংখ্যক আসন থাকায় অপরাধীদের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে সংশোধিত হচ্ছে অন্যদিকে কিশোর অপরাধীদের বৃহৎ একটি অংশ কারাগারে বংস্ক অপরাধীর সাথে সহ-অবস্থানের কারনে আরো আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে। সে জন্য সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি এসব সংস্থার কাজকর্মের প্রক্রিয়া কিশোরদের কাছে আকর্ষণীয়, উপভোগ ও গ্রহণযোগ্য করে তোলা দরকার। তাছাড়া এটাও মনে রাখা দরকার জেল হোক আর সংশোধন কেন্দ্র হোক আটকে রাখা মাত্রই শিশু কিশোরদের মাঝে এক ধরণের মানসিক বিপর্যয় ঘটে বা ঘটতে পারে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে অতিরিক্ত জনসংখ্যা। রাষ্ট্র মানুষ তার মৌলিক চাহিদা কোনোভাবেই মেটাতে পারছে না। কোন ভাবেই দিতে পারছে না সামাজিক নিরাপত্তা। আর এমন পরিস্থিতিতে কিশোররা সবচেয়ে বেশি হতাশ হয়ে পড়ছে। তারা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে মূল স্রোত থেকে। ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক জীবানাচরণ। পড়াশোনাও থেমে যায় একই কারণে। এসব সুযোগ কাজে লাগায় সুযোগ সন্ধানীরা। কিন্তু পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র যদি কিশোরদের সঠিক তত্ত্বাবধায়ন করতে পারতো তাহলে এমন হতো না।

এমতাবস্থায়, বর্তমান গবেষণাটিতে কিশোর-কিশোরী অপরাধীদের জনমিতিক, পারিবারিক ও অভিভাবক সংক্রান্ত তথ্যাবলী, কিশোর-কিশোরী অপরাধীদের ধরণ, কারণ ও অনুভূত চাহিদা, পরিবারের অভিভাবকদের প্রতি অপরাধীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অপরাধীদের প্রতি পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি ও কিশোর অপরাধীদের আর্থ-সামাজিক ও পারিবারি অবস্থা যথাযথভাবে চিহ্নিত করে সসম্যাটির কারণ উদঘাটন পূর্বক তা প্রতিরোধ, সংশোধন ও পূর্ণবাসন কিভাবে করা যায় জরিপ গবেষণার মাধ্যমে তা জানা যাবে বিধায় বর্তমান গবেষণার বিষয়টি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলা যায়। ইতোপূর্বে বাংলাদেশে কিশোর অপরাধীদের উপর গবেষণা হয়েছে, সময়ের প্রয়োজনে গবেষণার আলোকে তা যথেষ্ঠ নয়। আংশিক-প্রাসঙ্গিক যা কিছু হয়েছে তথাপিও ব্যাপক অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বর্তমান এ গবেষণার অবতারণা। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য

পাঠক, গবেষক, শিক্ষার্থীদেরকে তথ্য প্রদান ও জ্ঞানবর্ধনে সহায়তা করবে এবং সেই সাথে গবেষণার ফলাফল কিশোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধনে নীতি নির্ধারক ও পরিকল্পনাকারীদের তথ্য সহায়ক হবে ।

আজকের কিশোর ভবিষ্যতের রাষ্ট্রনায়ক । ভবিষ্যতে দেশের দায়িত্বভার আজকের কিশোরদেরই নিতে হবে । দিন দিন কিশোর অপরাধের যেভাবে বাড়ছে এখনই তা প্রতিরোধ করতে না পারলে জাতি চরম সঙ্কটে পড়বে । এ সমস্যার সঠিক সমাধান করা তখনই সম্ভব যদি এর কারণ, ব্যাপ্তি ও তার প্রতিকার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায় । ২০১১ সালের আদমশুমারীর তথ্যানুযায়ী জেলার মোট জনসংখ্যা ১৫২৪৪৯ জন । আর মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার মোট জনসংখ্যা ৭০৬৭৪ জন । (সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যাণ ব্যুরো,২০১১) ।

আমার গবেষণা এলাকা মুন্সীগঞ্জ পৌরসভায় ২০০১ সালের বয়সভিত্তিক আদমশুমারীর তথ্যানুযায়ী মোট জনসংখ্যা ৯৪৫১২ । এর মধ্যে কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা ২৮৯৮৮ জন । যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ভাগ । (সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যাণ ব্যুরো,২০০১) ।

এজন্যই আমি গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বাংলাদেশের কিশোর অপরাধের কারণ চিহ্নিত করার বিষয় নির্বাচন করেছি যাতে প্রতিকার করা সম্ভব হয় ।

১.৫ গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রধান উদ্দেশ্যঃ

বাংলাদেশের শহর এলাকার কিশোর অপরাধ পরিস্থিতি, কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে বাস্তব অবস্থা জানা ।

নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

(১) উত্তরদাতাদের জনমিতিক, আর্থ-সামাজিক ও ব্যক্তিগত তথ্যাবলী জানা ।
(২) উত্তরদাতাদের অপরাধের ধরন ও স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ।
(৩) উত্তরদাতাদের অপরাধের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্পর্কে জানা ।
(৪) উত্তরদাতাদের অপরাধের গতি প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত হবার প্রবণতা জানা ।
(৫) কিশোর অপরাধ কিভাবে প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা যায় সে বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত জানা ।

১.৬ প্রাক অনুমান/অনুমান গঠন

কিশোর অপরাধ নির্মূলে অনেক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কাজ করছে । এর কারন অনুসন্ধান করে সমাধান দিতে গিয়েও অনেকে প্রতিকূল অবস্থায় পড়েছে । আবার অনেকে কোনকোন ক্ষেত্রে সাময়িক সফলতাও পেয়েছে । এইসব বিভিন্ন প্রকিূলতার কারনসহ সফলতা/ব্যর্থতা সবই ফুটে উঠবে এই গবেষনার মাধ্যমে ।

Dhaka University Institutional Repository

১.৭ গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয় সমূহের সংজ্ঞায়ন

কিশোর :

কোন শিশু অথবা তরুণ বয়সের ব্যক্তি, সে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট একটি বয়স সীমার অর্থাৎ কিশোর বয়স সীমায় অবস্থান করে তাকেই কিশোর বলে অভিহিত করা হয। বাংলাদেশে বিদ্যমান "শিশু আই" ১৯৭৪" অনুযায়ী যে ব্যক্তির বয়স ১৬ (ষোল) বছরের নীচে, সে ব্যক্তি "কিশোর" বা শিশু হিসেবে গণ্য। বাংলাদেশে কতিপয় আইন ও নীতিমালায় যথা-শ্রম আইন, ফ্যাক্টরী আইন এবং জাতীয় শিশু নীতিমালা অনুযায়ী কিশোরদের বয়স সর্বোচ্ছ ১৪ বছর ধরা হয়েছে। তা'ছাড়া অন্যান্য আইনেও এ বয়স সীমার তারতম্য রয়েছে। আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতে বিশেষতঃ জাতি সংঘ শিশু সনদের আঙ্গিকে যে ব্যক্তির বয়স ১৮ (আঠার) বছরের নীচে সে ব্যক্তি শিশু হিসেবে গণ্য। তবে দেশের শিশু আইন, ১৯৭৪ অনুযায়ী শিশু-কিশোরের বয়স ১৬ বছরের নীচে হবে- এ বিষয়টি আইনগতভাবে এখনো বলবৎ আছে (বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা ও সংশোধনী কার্যক্রম, ডিসেম্বর-২০০২)

"A juvenile is a child or young person who, under the respective legal systems, may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult" (International Instruments of juvenile justice and non custodial measures, P-20, 2005, Unicef).

বর্তমান গবেষণায় ১৯৭৪ সালের আইন অনুযায়ী ১৬ বছরের নীচে শিশু-কিশোর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ "কিশোর" প্রত্যয় দিয়ে ১৬ বছরের নিচের বয়সী কিশোর এবং কিশোরী কে বুঝাবে।

অপরাধ :

সভ্য সমাজে সকল জনগণের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য যে প্রচলিত আইন, বিধি ও প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি প্রয়োগ করতে চায় এবং যার বিরুদ্ধে কাজ করলে শাস্তির বিধান থাকে সেই সমস্ত আইন, বিধি ও সামাজিক রীতিনীতি ভঙ্গ করাই হল অপরাধ।

"as an international act or omission in violation of criminal law, committed without defense or justification and sanctioned by the law as felony or misdemeanor" (Paul. W. Tappan).

"সমাজ বা গোষ্ঠী দ্বারা দৃঢ়ভাবে অসমর্থিত বা নিষিদ্ধ, এমন সব আচরণই অপরাধ। আবার যেহেতু সমাজভেদে এবং সমাজের অবস্থানভেদে সামাজিক রীতিনীতি ও আইন প্রথা ভিন্ন রূপ নেয় তাই অপরাধমূলক আচরণ ছড়ান্ত নয় বরং তা আপেক্ষিক" (Koenig)।

In the words of Donald Taft, "Crime is a social injury and an expression of subjective opinion varying in time and place (N.V. Parajape).

বর্তমান গবেষণায় "অপরাধ" প্রত্যয় দিয়ে কিশোর কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ কে বুঝাবে।

Dhaka University Institutional Repository

কিশোর অপরাধ :

অপ্রাপ্ত বয়স্কদের দ্বারা সংগঠিত সমাজ ও আইন বিরোধী এবং রীতিনীতি ও মূল্যবোধ পরিপন্থী কার্যকলাপই হচ্ছে কিশোর অপরাধ। সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, সমাজ কর্তৃক অসমর্থিত অথচ কিশোর কর্তৃক সংঘটিত সব কাজই হচ্ছে কিশোর অপরাধ।

প্রামান্য সংজ্ঞা :

(১) সমাজ বিজ্ঞানী সালমানের মতে, 'কিশোর অপরাধ বলতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর ওপর পরিবার ও সমাজের নিয়ন্ত্রণহীনতা বুঝায়।'

(২) বিসলারের মতে, 'কিশোর অপরাধ হচ্ছে প্রচলিত সামাজিক নিয়মকানুনের ওপর অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিশোরদের অবৈধ হস্তক্ষেপ।'

(৩) ডুবের মতে, 'শিশু ও কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত সামাজিকভাবে নির্ধারিত কোনো কাজ যদি প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী নির্ধারিত আইনের আওতায় আসে তবে তা কিশোর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।'

(৪) বার্ট-এর মতে, 'কোনো শিশুকে তখনই অপরাধী বলে মনে করতে হবে যখন তার অপরাধ ও অমানবিক কাজের প্রবণতার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।'

(৫) Etymologically, the term “Delinquency” has been derived from the Latin word delinquer, which means “to omit”. The Romans used the term to tefer to the failure of a person to perform the assigned task or duty. It was William Coxson who in 1484, used the term “delinquent” to describe a person found guilty of customary offence. In simpler words it may be said that delinquency is a form of behaviour or rather misbehaviour or deviation from the generally accepted norms of conduct in the society (N.V. Paranjape).

(৬) কিশোর কর্তৃক যে কোন মারাত্মক সমাজ বিরোধী কাজ যা সমাজের অন্যান্য সদস্যদের অধিকারে হস্থক্ষেপ করে এবং যা অপরাধীদের নিজের এবং সমাজের মঙ্গলের পথে হুমকি স্বরূপ তাও কিশোর অপরাধ। কিশোর অপরাধের সংজ্ঞা প্রসংঙ্গে এটাও বলা হয় যে, কিশোর বয়সীরা যেসব কাজ করলে সমাজ ও কিশোর জীবন বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে সেটাই কিশোর অপরাধ (গাজী সামসুর রহমান, অপরাধ বিদ্যা, পৃঃ ৭৯৬)।

(৭) Caldwell prefers “To leave the term vague and includes within it all acts of children which tend them to be pooled indiscriminately as wards of the sate” (Caldwell: Criminology, P.375).

(৮) কিশোর অপরাধ একটি বৃহদাঙ্গিক প্রত্যয়। এর আওতাধীনে আসা বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের অসংখ্য কার্যকলাপ। ফলে কিশোর অপরাধ প্রত্যয়টি কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে রয়েছৈ নানা মত পার্থক্য, ফলে আজ অবধি এর সার্বজনীন গ্রাহ্য কোন সংজ্ঞা গড়ে উঠেনি। তবুও সাধারণ অর্থে কিশোর অপরাধ বলতে বুঝায় কিছু সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ যা নির্দিষ্ট বয়সসীমার নিচে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত হয় এবং যা আইনগত নিষিদ্ধ অথবা কোন আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে আইনানুগ ব্যবস্থঅ নেয়ার তাগিদ সৃষ্টি করে (হাকিম আঃ সরকার, ২০০৫)।

১.৮ গবেষনার পদ্ধতি

ক. গবেষনায় ব্যবহৃত মূল পদ্ধতি ঃ বর্তমান গবেষণা মূলত একটি তথ্য উদঘাটনমূলক সামাজিক নমুনা জরিপ। সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে কেস স্ট্যাডি ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

খ. গবেষনার এলাকা ঃ প্রকৃত পক্ষে আমার গবেষণা হচ্ছে মুন্সীগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার মুন্সীগঞ্জ শহরের কিশোর অপরাধের প্রকৃতি, ধরন, ব্যাপ্তি এবং এর প্রতিকারের উপর।

গ. সমগ্রক ও বিশেষনের একক ঃ বাংলাদেশের সকল কিশোর অপরাধীকে বর্তমান গবেষণার সমগ্রক হিসেবে বিবেচিত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক কিশোর অপরাধীকে বিশেষনের একক হিসেবে ধরা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় কিশোর কিশোরী বলতে ৭ থেকে ১৭ বছর বয়সের শিশুকে বোঝানো হয়েছে।

ঘ. নমুনায়ন ঃ উদ্দেশ্য মূলকভাবে মুন্সীগঞ্জ শহরের কিশোর অপরাধীদের দৈবচারিত নমুনায়নের মাধ্যমে ১২০ জন নির্বাচন করা হয়েছে, যা ২০১২ সালের কিশোর অপরাধীর তালিকার ১৬% এবং তাদের কাছ থেকে গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০১২ সালে ৭৭১ জন কিশোর অপরাধীর তালিকা প্রকাশ করে। (তথ্যসূত্র : কিশোর অপরাধ সংশোধনী বুকলেট, ২০১২).

ঙ. তথ্য সংগ্রহের কৌশল ঃ পূর্ব পরীক্ষিত এবং মান যাচাইকৃত সাক্ষাৎকার অনুসূচীর সাহায্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বাংলাভাষায় লিখিত কাঠামোবদ্ধ অনুসূচী নিয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আবদ্ধ এবং উন্মুক্ত উভয় ধরণের প্রশ্নই এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহের জন্য সব ধরনের সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। র‍্যাপো স্থাপন, পর্যবেক্ষণ,সাক্ষাৎকার গ্রহণের পাশাপাশি কেস স্ট্যাডির মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে কিশোর অপরাধীদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

চ. তথ্য সম্পাদনা, বিশেষন এবং উপস্থাপনা ঃ প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে যথাযথভাবে সম্পাদনা করা হয়েছে। এরপর বিভিন্ন পরিসংখ্যানিক পদ্ধতির মাধ্যমে বিশেষন ও ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য, উপাত্ত প্রাথমিকভাবে বিশৃঙ্খল তা থেকে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তাই সংগৃহীত তথ্যের সারনীবদ্ধ করন এবং বর্ণনা প্রয়োজন হয়। ব্যাখ্যা করণ ও গবেষণা প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যে সব প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করে প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী সংগ্রহ করে সেগুলোকে সুসজ্জিত করনের পর ব্যবহার উপযোগী করে সিদ্ধান্ত গ্রহনের দিকে অগ্রসরমান প্রক্রিয়াই হল তথ্য বিশেষণ।

প্রথম অবস্থায় প্রাপ্ত তথ্যগুলো অবিন্যস্ত থাকে। এই অবিন্যস্ত স্কোর গুলোকে পরিসংখ্যান মূলক বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে বিন্যস্ত করা হয়। এবং তা পরিমানে বা সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। তাই

সংগৃহীত তথ্যাদির বিণ্যাস, বিশেষণ ও ফলাফল সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করার জন্য পরিসংখ্যান মূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণায় প্রশ্নমালার মাধ্যমে কিশোর অপরাধীদের নিকট থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রশ্নমালায় বদ্ধ ও উন্মুক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য সমূহের বিশ্লেষণের জন্য পরিসংখ্যান মূলক পদ্ধতিতে গনসংখ্যা, শতকরা হারের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তী অনুচ্ছেদ সমূহে গবেষণার উদ্দেশ্যানুযায়ী তথ্য সমূহকে গুচ্ছবদ্ধ করে ধারাবাহিক ভাবে আলোচ্য সারনিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

কিশোর অপরাধ ঃ ধারণা, কারণ ও প্রতিকার

২.১ কিশোর অপরাধ
২.২ কিশোর অপরাধের ধারনা
২.৩ কিশোর অপরাধ প্রকৃতি ও স্বরূপ
২.৪ বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের কারণ
২.৫ কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে করণীয়

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
কিশোর অপরাধ ঃ ধারণা, কারণ ও প্রতিকার

২.১. কিশোর অপরাধ ঃ

অপরাধ ও অপরাধী সম্পর্কে সমাজে বিভিন্ন ধারণা বিদ্যামান। এক সমাজে যা অপরাধরূপে চিহ্নিত হয়, অন্য সমাজে তা অপরাধ বিবেচিত নাও হতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গিলিন বলেন, সমাজে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী তারাই অপরাধী বা কিশোর- অপরাধী বলে বিবেচিত।" দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী যাকে অপরাধ বিবেচনা করা হয় না, সমাজের জন্য ক্ষতিকর বিবেচিত হলে সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে সেটাকে সমাজ বিরোধী কাজ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এধরনের কাজ যাদের দ্বারা সংঘটিত হয় সমাজবিজ্ঞানীরা তাদের অপরাধী হিসেবে গণ্য করতে পারে। যখন কিশোর-কিশোরীরা ঐরূপ অপরাধমূলক কার্যে লিপ্ত হয় তখন এইসব অপরাধকে Delinquency বা তরুণ বয়সীদের দূষ্ক্রিয়তা বা কিশোর অপরাধ বলা হয় (শামসুর রহমান, ১৯৮৯)।

আবার কখনো কষনো এইরূপ বলা হয় যে কিশোর আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত কিশোরই হচ্ছে "কিশোর অপরাধী"। এক্ষেত্রেও সমস্যা হচ্ছে কিশোর আদালত গুলির রায় বা অপরাধ নিরূপণ পদ্ধতি দেশ ও সমাজভেদে ভিন্ন হয়। সূতরাং বলা যেতে পারে যে, কোনও কিশোর প্রকৃত অর্থে অপরাধী কিনা, তা নির্ভর করে পিতামাতা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সমাজ এবং সর্বোপরি কিশোর আদালতের বিচারকের মনোভাবের উপর। ১৯৫০ সালের আগষ্ট মাসে লন্ডনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অপ্রাপ্ত বয়স্কদের দ্বারা সংঘটিত সব ধরনের আইন ভঙ্গমূলক এবং খাপছাড়া বা অসঙ্গতিপূর্ণ কিংবা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত নয় এমন সব আচরণই কিশোর অপরাধ। অপরাধ বিজ্ঞানী Cavan এবং Ferdinand- এর মতে, সমাজ কর্তৃক আকাঙ্খিত আচরণ প্রদর্শনে কিশোরদের ব্যর্থতাই কিশোর অপরাধ (Paranjape N.V) । আমেরিকান Children's Bureau কিশোর অপরাধের একটি আইনগত সংজ্ঞা নিরূপন করেছেন। সেটি হলো কিশোর দ্বারা সংঘটিত রাষ্ট্রীয় আইন এবং মিউনিসিপাল অর্ডিন্যান্স-বিরোধী সব কাজই কিশোর অপরাধ। অধিকন্তু কিশোর কর্তৃক যে কোন মারাত্মক সমাজ বিরোধী কাজ যা সমাজের অন্যান্য সদস্যদের অধিকার হস্তক্ষেপ করে এবং যা অপরাধীর নিজের এবং সমাজের মঙ্গলের পথে হুমকি স্বরূপ তাও কিশোর অপরাধ (Juvenile Court Statistics, USA, 1967)। কিশোর অপরাধের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে এটাও বলা হয় যে, কিশোর বয়সীরা যেসব কাজ করলে সমাজ ও কিশোর জীবন পিদাপন্ন হয়ে পড়ে সেটাই কিশোর অপরাধ। সাধারণভাবে বলা যায় যে, সমাজ কর্তৃক অসমর্থিত অথচ কিশোর কর্তৃক সংঘটিত সব কাজই হচ্ছে কিশোর অপরাধ।

বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৮২ মধারায় বলা হয়েছে যে, ৭ বছরের নীচে কোন শিশুর কোন কাজকেই অপরাধশূলক বলে বিবেচনা করা যাবেন। আবার ৮৩ ধারায় উল্লেখ আছে যে, ৭ বছরের উর্ধ্বে এবং ১২ বছরের নিচে কোন শিশু বা কিশোরের কাজকেও অপরাধমূলক বলে বিবেচনা করা হবে না যদি না সে বিশেষ কোন সময়ে বা পরিস্থিতিতে তার কৃতকর্মের প্রকৃতি এবং ফলাফল সম্পর্কে বোঝার এবং বিচার করার ক্ষমতা অর্জন করে (বাংলঅদেশের কিশোর বিচার ব্যবস্থা ও সংশোধনী কার্যক্রম, ২০০২)। অর্থ্যাৎ ১২ বছর বয়স পর্যন্ত কোন শিশু যদি তার কৃতকর্মকে অপরাধ বলে মনে করার ক্ষমতা অর্জন না করে

তাহলে তাকেও অপরাধ বলা যাবে না। আসলে কোন ভয়সের শিশুদের সমাজবিরোধী বা অপরাধ আইন বিরোধী কাজকে অপরাধ বলে গণ্য করা হবে সে সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী ও অপরাধবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী নাজমুল করিম বলেছেন "৭ থেকে ১৫ বা ১৬ বছরের শিশু কিশোররা কোন সমাজবিরোধী কাজ করলে তাদেরকে কিশোর অপরাধী বলা হয়।" ১৮৯৭ সালের রিফরমেটরী স্কুর এ্যাক্টের আওতায় আদালত কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত অনুর্ধ্ব পনের বছরের যুব অপরাধীদের কিশোর অপরাধী বলা চলে। আবার ১৯৭৪ সালের শিশু আইন অনুযায়ী ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু-কিশোররা কোন অপরাধ করলে তাদের কিশোর অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অতএব দেখা যায় যে কিশোর অপরাধ প্রত্যয়টি বেশ ব্যাপক। এটি কিশোরদের সব ধরনের বিদ্রোহমূলক এবং হিংসাত্মক কার্যাবলকিেও কিশোর অপরাধের অর্ন্তভূক্ত করে। এমন কি ভিক্ষ গ্রহণ, ভবঘুরেপণ্, অশ্লীলতা, চুরি করা, নেশাপান, জুয়া খেলা ইত্যাদি কাজও কিশোর অপরাধের পর্যাভূক্ত। বস্তুতঃ কিশোর কর্তৃক অপরাধ আইন বিরোধীসহ সব ধরনের অসামাজিক আচরণই কিশোর অপরাধ যা যথা সময়ে সংশোধন করা না গেলে প্রাপ্ত বয়স্কের শাস্তি যোগ্য গুরুতর অপরাধে উন্নীত হতে পারে।

২.২. কিশোর ও কিশোর অপরাধের ধারণা ঃ

কিশোর অপরাধ প্রবণতা সাম্প্রতিককালের একটি গুরুতব সামাজিক সমস্যা। উন্নত দেশগুলিতে এ সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও শিল্পায়ন ও শহরায়নের সাথে সাথে এ সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। কিশোর অপরাধীদের সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানীদের চিন্তা-ভাবনার শেষ নেই। এক সময় ছিল যখন সামান্য অপরাধের জন্য শিশু-কিশোরদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হত্ কিন্তু সভ্যজগতের মানুষ বিশেষ করে কিশোর অপরাধীদের আচরণকে অপরাধ বলেই মনে করে না বরং মানসিকভাবে সাজঞ্জস্যহীন বা অবস্থার শিকার বিবেচনা করে কিশোরদের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করে থাকে (রেবেকা সুলতানা, ২০০৪)। আমাদের দেশে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের কিশোর-কিশোরী হিসেবে বিবেচনা করা হলেও এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কিশোর অপরাধীদের বয়স-সীমার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। নীচের সারণীতে তা উপস্থাপন করা হলো-

সারণী- ১ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কিশোর অপরাধীদের বয়স-সীমা।

দেশের নাম	কিশোর অপরাধীদের বয়স-সীমা
বার্মা (মায়ানমার)	৭-১৬ বছর
শ্রীলংকা	৭-১৬ বছর
ভারত: যেখানে শিশু আইন কার্যকর	৭-১৬ বছর
ভারত: যেখানে রিফরমেটরী স্কুল এ্যাক্ট কার্যকর	৭-১৬ বছর
পাকিস্তান: যেখানে শিশু আইন কার্যকর	৭-১৬ বছর
পাকিস্তান: যেখানে রিফরমেটরী স্কুল এ্যাক্ট কার্যকর	৭-১৫ বছর
ফিলিপাইন	৯-১৬ বছর
থাইল্যান্ড	৭-১৮ বছর
জাপান	১৪-২০ বছর

সূত্রঃ The Journal of Social Development. I.S.W.R. Dhaka University. Vol-12, No-1, December, 1997.

সারণী- ২ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কিশোর অপরাধীদের বয়স-সীমা (পুনর্বিন্যাসকৃত) ।

দেশের নাম	কিশোর অপরাধীদের বয়স-সীমা
ইংলান্ড	৮-১৭ বছর
ফ্রান্স	১৩-১৬ বছর
পোল্যান্ড	১৩-১৭ বছর
অষ্ট্রিয়া	১৪-১৮ বছর
চেকোস্লোভিয়া	১৪-১৮ বছর
জার্মানী	১৪-১৮ বছর

সূত্রঃ The Journal of Social Development. I.S.W.R. Dhaka University. Vol-12, No-1, December, 1997.

এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মত আমেরিকাতেও কোন বয়সী কিশোর-কিশোরী দ্বারা কৃত অপরাধমূলক আচরণকে কিশোর অপরাধে হিসেবে চিহ্নিত করা হবে তার বয়স-সীমা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে । কিশোরদের বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেমন বিভিন্ন দেশে বয়স-সীমার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তেমনি কিশোর অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রেও সমাজবিজ্ঞানী ও অপরাধবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে । একারণে এখনও পর্যন্ত কোন অপরাধবিজ্ঞানী কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা সার্বজনীন রূপ লাভ করেনি । সাধারণভাবে বলা যায় কিশোর কর্তৃক সংঘটিত যে কোন সমাজবিরোধী কাজই কিশোর অপরাধ । (এক্ষেত্রে সংজ্ঞাটি স্থান কাল পাত্রভেতে বিবেচনা করতে হবে । কারণ এক সমাজে যা অপরাধ বলে বিবেচিত অন্য সমাজে তা অপরাধ বলে বিবেচিত নাও হতে পারে । এমনকি একই দেশের মধ্যে শহর এবং গ্রামে এরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হতে পারে) কিশোর অপরাধের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কিশোর অপরাধকে সমাজবিরোধী বলার সাথে সাথে আইন বিরোধী কাজ হিসাবে গণ্য করে বলা হয়েছে, "Ordinarily, it refers to the anti-social acts committed by persons under a given age. Such acts are either specifically forbidden by law or may be lawfully interpreted as requiring some form of official action" (Sarkar & Islam, 1997).

গাধারণত, একটি নির্দিষ্ট বয়স-সীমার ব্যাক্তি কর্তৃক সংঘটিত সমাজবিরোধী কাজকে কিশোর অপরাধ বলা হয় । এধরনের কাজগুলো হয় আইনের দ্বারা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন বলে বিধিসম্মতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে ।

২.৩. কিশোর অপরাধ ঃ প্রকৃতি ও স্বরূপ

মানুষ আবেগপ্রবন ও অনুকরণপ্রিয় । ফলে অনেক সময় আবেগে, অনুকরণের বশবর্তী হয়ে কিংবা প্রভাবানিত্ব হয়ে এক পক্ষ আইন অমান্য করে অপরাধমূলক আচরণে অন্যকে প্রলুব্ধ করে । আবার এমনও অনেকে আছে অন্যপক্ষ আইন মান্য করার শিক্ষা দিয়ে অপরাধপ্রবণতা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করে । যখন মানুষ অপরাধী হয় তখন তা এজন্য হয়ে থাকে যে, একদিকে যেমন সমাজের অপরাধমূলক মানুষের সংস্পর্শে আসে এবং অন্যদিকে ভালো মানুষের সংস্পর্শ থেকে নিজেদের দূরে রাখে । এতে

একদিকে যেমন সে সৎ প্রকৃতির লোকদের কাছ থেকে সুশিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হয়, অন্যদিকে অসৎ ব্যক্তিদের কাছ থেকে অসৎ আচরণে উদ্বুদ্ধ হয় ।

সমাজবিজ্ঞানীরা অপরাধমূলক আচরণ বিশ্লেষণে সামাজিক মেলামেশাকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেছে । তারা সঙ্গ, দল ও গোষ্ঠীর সঙ্গে ওঠা-বসা মেলামেশাকে গুরত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন । সেই সঙ্গ পারিবারিক সঙ্গ থেকে শুরু করে পরিবারের বাইরের বিভিন্ন সঙ্গের মাধ্যমে অপরাধমূলক কর্মকান্ডকে উৎসাহিত করে । মোটা দাগে এটি একটি প্রক্রিয়া, যা প্রচলিত আইনকানুন ভঙ্গকারী মানুষদের সঙ্গ ও ভঙ্গকারী ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার মাধ্যমে আইন ভঙ্গ করার কাজে এক ধরনের উৎসাহ তৈরি হয় । কাজটিকে আরো উৎসাহিত এবং অধিক কিংবা আজীবন এ কাজে নিজেকে যুক্ত করার মানসিকতা তৈরি হয় যখন অপরাধ করার পর শাস্তির আওতা থেকে অপরাধী নিজেকে দূরে রাখতে পারে । অপরাধ সৃষ্টি বা প্রেক্ষাপট এবং এ কাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ বিধায় সমাজে অপরাধের পরিসংখ্যান দীর্ঘায়িত হয় । ভদ্র ও সাদামাটা গোছের মানুষগুলোও অপরাধজগতে প্রবেশ করে । অর্থ রোজগারের জন্য অপরাধ এখন নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিশেষ করে বয়স্কদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না । কিশোর ও যুব সমাজের মধ্যেও তা ছড়িয়ে পড়ছে । আগে কিশোর অপরাধ বলতে মনে করা হতো তারা রাস্তাঘাটে হৈচৈ করবে কিংবা কারো বাগানে গিয়ে ফল চুরি করে খাবে । একটু বেশি হলে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে । কিন্তু এখন আর তা নয় । কিশোররা এখন মাদক, অস্ত্র, অপহরণনহ সব ভয়ঙ্কর অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে ।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মৌলিক প্রয়োজন এবং অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত আর্থিক লাভবান হওয়ার মানসে কিশোর ও যুব সমাজের মধ্যে অপরাধস্পৃহা দানা বাঁধে । বড়দের অপরাধের ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধতা কাজ না করলেও কিশোরদের ক্ষেত্রে এটি শতভাগ সত্য । কেননা তাদের মধ্যে অনেকেই পেশাদার অপরাধী নয় । অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা, দুষ্টমন কিংবা কাউকে অনুকরণ করে পূর্বপ্রস্তুতি কিংবা কিছু না ভেবেই অপরাধ করে ফেলে তারা । সফলও হয় । কিন্তু অপরাধী কোনো না কোনো আলামত রেখে যায় । ফলে গ্রেপ্তার কিংবা শাস্তি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা জটিল হয়ে পড়ে ।

বন্ধু ভয়ংকর শিরোনামে কালের কণ্ঠে সম্প্রতি প্রকাশিত কিশোর অপরাধ চিত্র আমাদের অনেককে হতবাক করে তোলে । ভয়ংকর এ বন্ধুর কাছ থেকে ভিকটিম পরিবার বাঁচতে পারল না । এমনকি বাসা বদল করেও তাদের রেহাই হলো না । ভয়ংকর বন্ধুটির অপরাধ আমরা বয়স্কদের মধ্যেও যে বেশিমাত্রায় লক্ষ করি তা নয় । একটি ছেলের সরলতার সুযোগ নিয়ে যে ভয়ংকর কাজটি বন্ধুটি করেছেন তা বয়স্ক অপরাধকেও হার মানায় । আমাদের উদ্বেগের বিষয় তখন যখন আমরা দেখি যে ধরনের অপরাধ বয়স্কদের করার কথা সেই ধরনের অপরাধ কিশোরদের দ্বারা ঘটছে ।

যে বয়সটা আগামীর পথে হাঁটার, যে বয়সটা দুরন্তপনার কিংবা আবিষ্কারের নেশায় মোহাবিষ্ট হওয়ার, সেই বয়সেই কিছু কিশোর ভয়াবহ অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে । আতংকের কারণ হয়ে উঠছে দেশ ও সমাজের জন্য । মূলত পারিবারিক ও আর্থিক নিরাপত্তাহীনতাই তাদের ঠেলে দিচ্ছে এ ধরনের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে । এতে যে শুধু তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা নয়, জাতির জন্যও তা অশনি সংকেত । দিন দিন এদের সংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমনি তারা বেপরোয়াও হয়ে উঠছে । তাদের বয়সী অন্য কিশোরকে খুন করার মতো নির্মম ও নিষ্ঠুর কাজ করতেও তারা দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছে না । তথ্যানুযায়ী এসব কিশোর অধিকাংশই মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান ।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, কিশোরদের এভাবে অপরাধে জড়িয়ে পড়ার কারণ মাদক। আমাদের সমাজে মাদক প্রাপ্তি এতটাই সহজ যে অনায়াসেই তা শিশু-কিশোরের আয়ত্তে চলে আসছে। এছাড়া কিছু অর্থলোভী মাদকব্যবসায়ী মাদক বহনে কিশোরদের ব্যবহার করছে। ফলে মাদকের সংস্পর্শে আসা এবং আসক্ত হওয়া এসব কিশোরের জন্য আরো সহজ হয়ে উঠছে। এছাড়া কৌতূহল এবং সঙ্গদোষেও অনেকে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। ফলে তাদের ভেতর থেকে মানবিক বোধগুলো সহজেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে এবং তারা যে কোনো ভয়ংকর অপরাধ ঘটাতে পিছপা হচ্ছে না। পারিবারিক অস্বচ্ছলতা, ভালোবাসার বঞ্চনা, ভগ্ন পরিবারে বেড়ে ওঠা, শিক্ষার পরিবেশ থেকে দূরে থাকার পাশাপাশি অল্প বয়সেই মোবাইল ফোন ব্যবহারের কারণেও কিশোর অপরাধীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে সচ্ছল পরিবারের কিশোরদের অনেকে খামখেয়ালিপনার কারণে নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। মোট কথা পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাহীনতা কিশোরদের মনে ভবিষ্যত সম্পর্কে এক ধরনের অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করায় তাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীসহ কিশোররা অপরাধে জড়িয়ে পড়ায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও উদ্বিগ্ন। পুলিশ ও কারাগার সূত্র জানায়, কিশোর অপরাধের মাত্রা কমছে না। বরং বেড়েই চলেছে। তবে বেশির ভাগ ঘটনায় কিশোররা দ্রুত জামিন পেয়ে যাচ্ছে। এ কারণে কারাগারে কিশোর অপরাধীর সংখ্যা কম।পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই এসব সমস্যা সমাধানে সর্বাত্নক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নইলে এর পরিণাম পুরো জাতিকেই ভোগ করতে হবে। আজকের শিশু ও কিশোররাই দেশের আগামীর ভবিষ্যত। তাদের রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট মহল তৎপর হবে-এ প্রত্যাশা আমাদের।

২.৪ কিশোর অপরাধের কারণঃ

(১) মনস্তাত্ত্বিক কারণ :

ক. বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সহনশীলতার অভাব খুব বেশি। এ সমস্যার অন্যতম কারণ অপরিণত আবেগের বৃদ্ধি । মনস্তত্ত্বের ভাষায়, অপরিণত মনস্তাত্ত্বিক উন্নতি মানে সুস্থ আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত বৃদ্ধি ঘটতে না দেয়া। সহনশীলতা ব্যাপারটা সৃষ্টি হয় আবেগ থেকে। সেই স্বতস্ফূর্ত আবেগে যদি বাধা আসে, তাহলে সহনশীলতার অভাব ঘটতে বাধ্য। এই মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়ই কৈশোরে অনেক অপরাধের মূল।

খ. শিশু-কিশোরদের আমরা নৈতিক কিছুই ঠিকমতো শেখাই না। ফলে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে তারা সেভাবে সচেতন হয়ে উঠতে পারে না। জীবনে অনেক জিনিসই পাওয়া যায় না। না পাওয়া ব্যাপারটা যে জীবনেরই অঙ্গ, আমরা তা কিশোরদের শিখাই না।এমনিতেই বয়ঃসন্ধির সময় হরমোন এবং শারীরিক পরিবর্তনের জন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমস্যা

দেখা যায়, এ সমস্যা এতোটাই মারাত্নক হয়ে ওঠে যে, তখন কোনো ব্যর্থতা দেখা দিলে তারা তা সহ্য করতে পারে না। সহ্য না করতে পেরে তারা ভেতরে ভেতরে নানাভাবে অপরাধী হয়ে ওঠে। আবার কেউ কেউ এক ধরনের পলায়নপর মনোবৃত্তির আশ্রয় নেয়। শেষ পর্যন্ত আত্নহত্যার পথ বেছে নেয়া ছাড়া তাদের আর কোনো রাস্তা থাকে না। এটি যেমন পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে ঘটে থাকে, তেমনটা ঘটে থাকে প্রেম বা অন্য কিছুর ক্ষেত্রেও ।

গ. কোনো কোনো ছেলেমেয়ে এ বয়সে অনেক তৎপর হয়ে যায়। তারা মিথ্যের মধ্যেই থাকতে শুরু করে। মিথ্যে আর সত্যের মাঝে পার্থক্য ক্রমশ তাদের কাছে মুছে যায়। অবাস্তব বা রোমান্টিক স্বপ্ন

Dhaka University Institutional Repository

দেখতে শুরু করে তারা। মাতা-পিতার সঙ্গে যত বেশি মানসিক বিভেদ, বাড়িতে যত অশান্তি বাড়তে থাকে, ততই এ মিথ্যাচারও বাড়তে থাকে। পলাতকী মনোভাব থেকে এ মিথ্যা বিশ্বাস, মিথ্যা কথার ব্যাপারটা আসে। এ বয়সে ছেলেমেয়েরা একটু বেশি স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে। মাথা পিতার মধ্যে কোনোও রকম টেনশন থাকলে বা নিঃসঙ্গ বোধ করলে ছেলেমেয়েরা খুব বেশি স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে। অসম্ভব জেদি, রাগী, একগুঁয়ে, সন্দেহপ্রবণ হয়ে এমন একটা পর্যায়ে তারা ক্রমশ চলে যায় যে, শেষ পর্যন্ত জীবন বিমুখ হয়ে পড়ে। সব রকম আনন্দ স্পৃহা, উৎসাহ থেকে দূরে চলে যায় এবং একেবারে খেতে চায় না। খিদেই পায় না এবং এদের শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায় না। যারা এতদূর যায় না তাদের অনেকেই বিষণতায় ভোগে।

ঘ. একটি কিশোরের ভেতর অহং খুব স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হতে থাকে। তাদের হাবভাবও ক্রমশ যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। ওরা বুঝতে পারে, যদি সে পরীক্ষায় ভালো ফল করে, তাহলে মা তাকে ভালোবাসবে। এ মানসিকতার ফলে মা-শিশুর মধ্যে স্বাভাবিক ভালোবাসার ঘাটতি দেখা যায়। ভালোবাসা ব্যাপারটা শর্তসাপেক্ষ হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারটা শুরু হয় স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় এ থেকেই। স্কুলে ভর্তি হওয়ার চাপ থেকে এই চাপ তৈরি হয়। তখন থেকেই দূরে সরে যায় সহজ সরল জীবনের যাবতীয় সম্ভাবনা।

ঙ. অতি অল্পবয়স থেকেই কিশোরকে একটা যান্ত্রিক রুটিনের মধ্যে বেঁধে ফেলার চেষ্টা চলে। সে যেন কোনো এক উপকরণ বা কাঁচামাল। ওই যান্ত্রিক রুটিনের মধ্যে তাকে ক্রমশ বড় করে তোলা হয়। সে যখন বন্ধুদের সাথে খেলছে, তখন হয়তো তাকে টেনে হিঁচড়ে অঙ্ক করানোর জন্য টিচারের কাছে বসিয়ে দেয়া হল। পড়ানো শেষ না হতেই সাঁতারের সময় হয়ে যায়। তখনই আবার দৌড়। এরপর নাচগানের ক্লাস আছে। ড্রইং শেখা রয়েছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে, এ সব যান্ত্রিকতা ওদের ভালো লাগে না। এ ধরনের যান্তিকতায় তারা মরিয়া হয়ে পড়ে। ফলে পড়াশোনাটা স্বাভাবিকভাবে হয় না, পুরোটাই জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়, নাও এবার এটা মুখস্থ করো- এ মনোভাবে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। স্কুলে গিয়েও একই পদ্ধতির শিকার হয়।

চ. কিশোররা অনেক কিছু আঁচ করে নিতে পারে। তারা বুঝতে পারে বাবা মায়েরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ক্রমাগত ভাবনা-চিন্তা করছেন। বাবা-মায়ের উদ্বেগ তাদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে, এ ব্যাপারে কোনোও সন্দেহ নেই। কিশোরদের মনেও তৈরি হয় অপরাধবোধ।

ছ. বাবা-মায়েদের কৃত্রিম ব্যবহারও কিশোররা বেশ বুঝতে পারে। সারাদিনের ধকল সামলে বাবা মায়েরা নিতান্ত অনীহা সত্ত্বেও যখন ছেলেমেয়েদের সঙ্গ দেন হাসিমুখে রাজ্যের ক্লান্তি নিয়ে, তখন সে বুঝতে পারে বাবা কিংবা মায়েরা ক্লান্তি, বিরক্তি সত্ত্বেও মুখে উৎসাহের ভান করছেন। তাদের সংবেদনশীল মন এ ব্যাপারটা বুঝতে পারে এবং ক্রমশ বাবা-মায়েদের মেকি ব্যবহারে দুই পক্ষের মাঝে দূরত্ব তৈরি হয়ে যায় নিজেরই অজান্তেই। ফলে পরীক্ষায় খারাপ ফল বা প্রেমে ব্যর্থ হলে বাবা-মায়ের কাছ থেকে সাহায্য চাইতে পারে না। অন্যদিকে ব্যর্থতা মেনে নিতে না পেরে আত্নহননের
পথ বেছে নেয়।

জ. অভিভাবকেরা সব সময়ই চান তাদের চাহিদামতো সন্তানটি বেড়ে উঠবে। অর্থাৎ তার কোনো স্বকীয়তা থাকার দরকার নেই, তারা যেমনটি চাইবেন, ঠিক তেমনটি তাকে হতে হেবে। একচুল এদিকে ওদিক হবার জো নেই।

ঝ. একসময় মায়ের ভালোবাসা ছিল শর্তহীন। আমার সন্তান সুতরাং চাওয়া-পাওয়ার হিসেব না করে হৃদয়ের নিষ্কলূষ ভালোবাসা দিয়ে যাব এ মনোভাব কাজ করত। মা মানেই সকল দুঃখের অবসান, অফুরান ভালোবাসা এ শ্বাশত ধারণা ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে। আজকাল মায়েরা নিজস্ব জগৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। ফলে মায়ের ভূমিকা এখন মিশ্র।

(২) স্বভাবগত কারণঃ

কিশোরদের অপরাধী হওয়ার পিছনে কিছু স্বভাবগত কারণও রয়েছে। বিশেষত নিম্নোক্ত কয়েকটি স্বভাব ওদের অপরাধী করে তোলে। যেমন: নির্দয় ব্যবহার, অতিরিক্ত অবাধ্যতা, স্কুল পলায়ন, দেরিতে ঘরে ফেরা, মলিন পোশাক পরিধান, শারীকি অপরিচ্ছন্নতা, অকর্তিত কেশ, দুঃসাহসিকতা, অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তা, অতিমাত্রায় ছায়াছবি প্রিয়তা ইত্যাদি।

(৩) কৈশোরে বিশেষ চাহিদাঃ

ক. স্বাধীনতা ও সক্রিয়তার চাহিদা: এ বয়সে কিশোর- কিশোরীরা সর্ব ব্যাপারে স্বাধীন হতে চায়। তার আত্নসম্মানবোধ মনে প্রচণ্ড আত্নবিশ্বাস সৃষ্টি করে। দায়িত্ব বহন করার, নিজের মত প্রকাশ করার, দশের মধ্যে একজন হবার প্রবল আকাঙ্খা তার মধ্যে দেখা দেয়। তখন সে সদা কর্মমুখর থাকে। তার এ স্বাধীনতা ও সক্রিয়তাবোধ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

খ. সামাজিক বিকাশের চাহিদা: বয়ঃসন্ধিকালে সমাজ চেতনার বিকাশ খুব গভীর হয়। আত্নসম্মান ও মর্যাদাবোধ তাকে সামাজিক বিকাশে সহায়তা করে। গৃহের বন্ধন অপেক্ষা বাইরের আহবান তাকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। সে তখন বৃহত্তর সমাজ জীবনের ভাবের দোসর খোঁজে, সঙ্গীসাথীদের সাথে মেলামেশায় সুযোগ গ্রহণ করে, অপরিচিতের মধ্যে আত্নীয়তা খোজে । শুধু কিশোর অপরাধ নয়, সমাজের সকল ধরনের অপরাধের মূল কারণ সমাজের মধ্যেই রয়েছে। আর এটি হচ্ছে বিক্ষিপ্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। অপরাধ এই পুঁজিরই অংশ। যারা পুঁজিপতি তারা বিভিন্নভাবে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে অপরাধের আশ্রয় নিচ্ছে, শক্তি প্রয়োগ করছে। যার ফলে সমাজের যে মূল কথা সেটা আর কার্যকর থাকছে না। এটা ব্যক্তিগত হয়ে উঠছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে সমাজ আরো বর্বর, আরো জংলি হয়ে উঠছে। যে সব শিশু-কিশোর অপরাধের দিকে হাঁটছে তাদের সামনে কোনো লক্ষ্য বা ভবিষ্যৎ নেই। সমাজ এই ভবিষ্যৎ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে। আজকে আমরা তাদের সামনে কোনো দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারিনি। যে চেতনা দিয়ে এক সময় কিশোররা মুক্তিযুদ্ধ করেছে সেটা আর সমাজে বিদ্যমান নেই। সে কারণেই কিশোর অপরাধ বাড়ছে। কিশোররা লক্ষ্যহীন হয়ে পড়ছে। এর থেকে বের হয়ে আসতে আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

গ. আত্নপ্রকাশের চাহিদা: এ বয়সে অরেকটি চাহিদা হলো নিজেকে প্রকাশ করা। আবেগপ্রবণ হওয়ায় বিভিন্ন সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে তারা নিজেদের মূল্যবোধকে সমাজের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সমাজের অন্যান্য ব্যক্তি তাদের এ কর্মের মূল্য দেবে এটাই তারা বিশেষভাবে চায়। এ চাহিদার তৃপ্তি ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। এ চাহিদা পূরণ না হলে তারা দুর্বলচেতা, আত্নবিশ্বাসহীন ও নিষ্ক্রিয় হয়। পড়াশুনা, খেরাধুলা, গান বাজনা, অভিনয়, অংকন, কবিতা লেখা, পত্র-মিতালী, ডায়েরি লেখা এবং অন্যান্য কালেজের মাধ্যমে তারা আত্নপ্রকাশ করে।

ঘ. আত্ননির্ভরতার চাহিদা: আত্নপ্রকাশের চাহিদা থেকেই আত্ননির্ভরশীল হওয়ার ইচ্ছা জাগে। তারা ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা শুরু করে। পরনির্ভর না হয়ে স্বাধীন জীবন যাপনের প্রবল ইচ্ছা বয়ঃসন্ধিকারে দেখা দেয়। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখে। ভবিষ্যতে কোন ধরনের পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করবে সে চিন্তা সে করে। উপযুক্ত পেশা নির্বাচনে মাতাপিতা ও শিক্ষকের সহায়তা এ বয়সে বিশেষভাবে প্রয়োজন।

ঙ. নতুন জ্ঞানের চাহিদা: এ বয়সে মানসিক বিকাশ পূর্ণতা লাভ করে। ফলে কৌতূহলপ্রিয়তা, অজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে দেখা দেয়। নতুন কিছু জানতে চায়, শিখতে চায়, অসীম কৌতূহলে বিশ্বের জ্ঞান ভান্ডার আহরণ করার তাকিদ অনুভব করে। এ স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষাকে যদি মাতা-পিতা, শিক্ষক, অভিভাবকবৃন্দ সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারেন তবে এ ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যৎ জীবনে, কর্মক্ষেত্রে, সমাজে সাফল্য লাভ করতে পারে।

চ. নীতিবোধের চাহিদা: বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের মধ্যে নীতিরোধ জাগ্রত হয়। ভালো মন্দ, ন্যায় অন্যায়, উচিত অনুচিত বোধ সে মন থেকে উপলব্ধি করে। নিজের এবং অপরের কাজকে নীতিবোধের মানদণ্ডে বিচার করে। সমাজের রীতি নীতি, আদর্শবোধ তার বিবেককে নাড়া দেয়। নিজে নীতিবিরোধী কোনো কাজ করলে তার মনে অপরাধবোধ সৃষ্টি হয়।

ছ. নিত্য নতুন চমকপ্রদ ও অভিনব বিষয়ে আগ্রহ: প্রাত্যহিক জীবনের কার্যক্রম এ বয়সের ছেলেমেয়েদের একঘেঁয়ে এবং বিরক্তিকর মনে হয়। তারা চায় নতুন নতুন চমকপ্রদ ও অভিনব বিষয়ের মাধ্যমে আনন্দ পেতে। তারা চায় দল বেঁধে পিকনিক করতে অথবা সিনেমা দেখতে। শিক্ষককে ফাঁকি দিয়ে স্কুল থেকে পলায়ন, রাতের অন্ধকারে পাড়া প্রতিবেশীর বাগানের ফল চুরি করা, সিগারেট বা মাদকদ্রব্য চেখে দেখা ইত্যাদি কাজে তাদের অসীম আগ্রহ ও নিষ্ঠা দেখা যায়। মাদকাসক্তদের কেইস হিস্ট্রি থেকে জানা যায় প্রথম মাদকদ্রব্য সেবনের অভিজ্ঞতা তাদের হয়েছে সহযোগী বন্ধুদের পরামর্শে অ্যাডভেঞ্চার করতে যেয়েই এবং পরবর্তীতে ড্রাগস এর মরণ ফাঁদে তারা জড়িয়ে পড়েছে।

জ. নিরাপত্তার চাহিদা: বেশির ভাগ কিশোর-কিশোরীর মনে নিজের কর্মক্ষমতা, পরিবারের দলে অথবা স্কুলে তার অবস্থান এবং নৈতিক মূল্যবোধ এর সমন্বয়ে নানারকম মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।এ দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে তারা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে অসহায় বোধ করে। এ বয়সের চাহিদাগুলোর পাশাপাশি শাস্তি পাওয়ার ভয়ও তাদের মনে কাজ করে। ফলে তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

ঝ. আত্ম পরিচিতির চাহিদা: এ বয়সের ছেলেমেয়েদের নিজ সম্পর্কে ধারণা পাকাপোক্ত হয়। তারা এর মাধ্যমে নিজের পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করতে চায়।এ বয়সের ছেলেমেয়েরা সমাজে তার স্থান ও ভূমিকা নিয়ে চিন্তা করে এবং যাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, উদ্যম ও স্বাধীনভাব অর্জিত হয়, তারা নিজেদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধনাত্মক পরিচিতি লাভ করে। অন্যদিকে, নিজ সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা থাকলে অনেক সময় আত্মসংযম হারিয়ে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কিশোর কিশোরীরা এ বয়সে মাতা-পিতার ও সমাজের মূল্যবোধকে তীক্ষ্ণভাবে যাচাই করে আত্ম-পরিচিতি গড়ে তোলে।

(৪) কিশোর অপরাধের কারণ হিসেবে মাতা-পিতা :

মা-বাবার কারণে অনেক সময় সন্তানরা কিশোর অপরাধী হয়ে থাকে-

ক. সংসারত্যাগী বা পলাতক মাতাপিতা: এরা সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না করে পলাতক হয়েছেন।এসব সন্তান এদের স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত থাকে।

খ. অপরাধী মাতাপিতা: এরা সন্তানকে পাপের মধ্যে রেখে বড় করেন। কখনওবা সন্তানের সহায়তায় পাপ করেন।

গ. অপকর্মে সহায়ক মাতা-পিতা: এরা সন্তানের অপরাধ স্পৃহায় উৎসাহ দেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. দুসচ্চরিত্র মাতা-পিতা: তারা নির্বিচারে সন্তানের সামনেই নানা অসামাজিক কাজ করেন ও কথা বলেন।

ঙ. অযোগ্য মাতা-পিতা: এরা সন্তানকে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদানে ব্যর্থ হয়।আধুনিককালে শহরগুলোতে দেখা যায় যে, মা বাবা উভয়ে ঘরের বাইরে কাজ করছেন। ফলে সন্তানসন্ততি তাদের উপযুক্ত সু-শাসন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তারা আচরণে বিদ্রোহধর্মী হয়ে যাচ্ছে। এমনটিও দেখা যায় যে, মৃত্যু বা বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে কোনো কোনো কিশোর মা অথবা বাবাকে হরাচ্ছে। এ কারণেও কিশোরদের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে সমস্যা দেখা দেয় এবং তারা সংলগ্ন আচরণ তথা সমাজবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হয়। অধিকন্তু পারিবারিক পরিমণ্ডলে কোনো শিশুকিশোর যদি সর্বদা ঝগড়া-বিবাদ, ব্যক্তিত্বের সংঘাত এবং অপরাধমূলক ও হিংসাত্নক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে তাহলে তাদের পক্ষে কিশোর অপরাধী হয়ে উঠা অসম্ভব নয়।

(৫) দারিদ্র্য :

দারিদ্র্য যে অপরাধের জন্য দায়ী তা বলাই বাহুল্য। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত পরিবারের কিশোর-কিশোরী তার নিত্য দিনের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণে ব্যর্থ হয়। ফলে তার মধ্যে কিশোর অপরাধমূলক আচরণ সৃষ্টি হতে পারে। এ কারণে এরা ছোট-খাটো চুরি বা ছিনতাই-এ অংশগ্রহণ করে। দারিদ্র্যের কারণে আত্নহত্যা বা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতেও বাধ্য হয় অনেক কিশোর-কিশোরী। শিশুশ্রম নিষিদ্ধ সারাবিশ্বেই। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। তা সত্ত্বেও এদেশে সর্বত্রই শিশুশ্রম আছে। বিদেশীদের হস্তক্ষেপে গার্মেন্টস কারখানায় শিশুরা এখন আর কাজ করে না, কিন্তু যাত্রীবাহী বাসে কিংবা ট্রাকে এরা কাজ করছে। বাসে যে শিশুরা কাজ করে এদের অধিকাংশের বয়স ১০ থেকে ১২ বছর। যে বয়সে মা-বাবার আদরে আহলাদে এদের স্কুলে যাওয়ার কথা, বিকেলে সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলা করার কথা, সে বয়সে এরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা কাজ করছে। মাঝে মাঝে ছোট বাসের ভেতরে অথবা হ্যান্ডল ধরে ঘুমিয়ে পড়ে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে। অন্য দিকে যাত্রীদের দুর্ব্যবহার তো এদের নিত্যদিনের সঙ্গী। একটু আদর, একটু ভালোবাসার কাঙাল এ শিশুদের সুযোগ দেয়া হলে এরাই একদিন দেশের সম্পদে পরিণত হতে পারে। দরিদ্র মাতা-পিতার ঘরে জন্ম নেয়াই এদের অপরাধ। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে নাগরিকদের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় ও চিকিৎসাসহ জীবনধারনের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা। তাছাড়া দেশে বিদ্যমান আছে অনৈতিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৩৩ । কিন্তু সংবিধান, আইন সব কিছুই নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে অদ্যাবধি অসমর্থ। অসংখ্য শবমেহের এর আত্নদান তারই প্রমাণবহ। দুঃখ ও দুর্ভাগ্যজনক হলেও একথা সত্য যে, আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ইশতেহারে যেসব প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করেন তা শুধু রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য। বাস্তবতার সাথে তার কোনো মিল থাকে না। আর এসব বাস্তবতা আমাদের সমাজে বাড়িয়ে দিচ্ছে দুর্নীতি এবং বিভিন্ন ধরনের অপরাধ। দুর্নীতি, অপরাধের সে থাবা ছাড়ছে না আমাদের কিশোরদেরও। এমতাবস্থায়, জঠর যন্ত্রণা নিবৃত্তির জন্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক কোনো কিশোরকিশোরী বাধ্য হয়ে যদি দুষ্কর্মে বা পাপাচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে কতখানি দোষারোপ করা যায় তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।সুতরাং, দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবনধারনের মৌলিক উপকরণসমূহ কীভাবে নিশ্চিত করা যায় তা নিয়ে জাতীয়ভিত্তিক সর্মসূচি নিতে হবে। এ দায়িত্ব পরিবার প্রধান থেকে শুরু করে রাষ্ট্র প্রধান পর্যন্ত সবার। এ লক্ষ্যে সামাজিক ন্যায় বিচারের স্বার্থে সম্পদের সুষম বণ্টনসহ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে অতি দরিদ্র ও দুস্থদের জন্যে অর্থনৈতিক-আর্থিক নিরাপত্তামূলক সুযোগ সুবিধাদির ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্যে বিশেষ করে অনগ্রসর অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার

মান গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তবে সবার আগে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করা ছাড়া দারিদ্র্য দূর করার কোনো উপায় নেই।

সূত্রঃ বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে (http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Bangladesh)

(৬) সুষ্ঠু বিনোদন সঙ্কটঃ

শিশু-কিশোরদের জন্য চাই উপযুক্ত চিত্তবিনোদনমূলক ব্যবস্থা। এজন্য খেলাধুলা, শরীরচর্চা, সঙ্গীত এবং নানাবিধ সুস্থ বিনোদনধর্মী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এসবের অভাব শিশু-কিশোরকে যত্রতত্র রাস্তাঘাটে ঘুরতে ফিরতে এবং ছুটাছুটি করতে দেখা যায়। এ ধরনের বিশৃঙ্খল ঘোরাফেরা কিশোরদের মনে সাময়িক আনন্দ দিলেও বস্তুত পক্ষে তা একটি আদর্শ ও সুশৃঙ্খলা পরিবশে সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। আর এ কারণেও কিশোররা অসৎ সঙ্গে মেশে এবং একটি অনিয়মতান্ত্রিক পন্থার মধ্যে সময় কাটানোর কারণে তাদের চরিত্রে অনিয়ম এবং অসংলগ্নতার সৃষ্টি হয় এবং পরিণামে তারা হয়ে ওঠে অপরাধপ্রবণ।প্রসঙ্গত আকাশ সংস্কৃতির অপব্যবহারের কথা বলা প্রয়োজন। ইদানীং নিয়ম নীতিহীনভাবে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে ওঠা সাইবার ক্যাফেগুলোতে ইন্টারনেট ব্যবহারের নামে চলছে রীতিমত পর্নোগ্রাফির প্রদর্শনী। সার্ভিস চার্জ কম হওয়ায় এবং অন্যান্য অসৎ সুবিধা থাকায় উঠতি বয়সীরা এখন সাইবার ক্যাফের প্রধান গ্রাহক। অবাধ তথ্য প্রযুক্তির নামে অশ্লীল ওয়েবসাইটগুলো হয়ে উঠছে তাদের বিনোদনের প্রধান মাধ্যম হিসেবে। শিক্ষার্থীরা নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে নানা অজুহাতে বেরিয়ে এসে সাইবার ক্যাফেতে ঢুকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পর্নো ওয়েবসাইট ব্রাউজিং করছে। এখানে এক ভিন্ন নেশায় মত্ত হয়ে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনকি কেউ কেউ পুরোদিনই চ্যাটিংয়ে ব্যস্ত থাকছে। এর ফলে পড়াশোনার প্রতি তাদের অমনোযোগিতা সৃষ্টিই শুধু নয়, বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়াসহ নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটছে।দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বিভিন্ন দেশে সাইবার ক্যাফে ব্যবসা পরিচালনার জন্য সাইবার নীতিমালা থাকলেও বাংলাদেশে এখনও তা প্রণীত হয়নি। কিশোরদের জন্য উপযুক্ত কিশোর সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্র ও বিনোদন কেন্দ্রের চরম সঙ্কট রয়েছে আমাদের।

(৭) শিল্পায়ন ও নগরায়নঃ

শিল্পায়নের ফলে নগরায়ন ত্বরান্বিত হয় এবং শিল্পনির্ভর নগর জীবনে কতিপয় সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এগুলোর মধ্যে আবাসিক সমস্যা অন্যতম। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ বস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং গোটা শহর জনাকীর্ণ হয়ে পড়ে। চরম আবাসিক সঙ্কটের কারণে জনাকীর্ণ এলাকার কিশোরদের চলাফেরা, গল্পগুজব এবং নানা ধরনের মেলামেশা বৃদ্ধি পায়। একদিকে দারিদ্র্য অন্যদিকে অবাধ ও সারাক্ষণ দলবদ্ধ জীবনযাপন করতে গিয়ে অনেক সময় কিশোরদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা জাগে। তাদের এই অপরাধপ্রবণতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে দুঃসাহসিক অভিযান ও কাজকর্মকে কেন্দ্র করে। এ অবস্থায় তারা কখনও একাকী আবার কখনও বা ছোট ছোট দল বেঁধে নানা ধরনের অপরাধকর্মে লিপ্ত হয়।বাংলাদেশের শহর এলাকার মধ্যে রাজধানী ঢাকা শহরের চিত্র ভয়ঙ্কর। বস্তি আর রাস্তায় বেড়ে উঠা শিশু-কিশোররা সবকিছু এখানেই রপ্ত করে। এরা চলতে শিখলেই ছোট ছোট চুরি করে। একটু সাহস হলেই স্ট্রিটলাইট, ম্যানহোল, ইট, রডের টুকরো চুরি করে। পরবর্তীতে পরিবেশ পরিস্থিতি এদেরকে ক্রমশ মাদকদ্রব্যের দিকে টেনে নেয়।কখনও এরা পরিণত হয় রাজনৈতিক দলের টোকাইবাহিনী যা হয়ে ওঠে হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ তথা কোনো দলীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নের হাতিয়ার। এদের ব্যবহার করা হয় অস্ত্র বহনের কাজে। এমনকি মাঝে মধ্যে ওদের ব্যবহার করা হয় মানুষ মারার মতো ঘৃণ্য ও ভয়াবহ কাজে। দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীদের সহযোগী হিসেবেও এরা কাজ করে থাকে। অপরদিকে ছিন্নমূল কিশোরীরা নেমে পড়ে ভাসমান পতিতাবৃত্তিতে। কিন্তু এ তো গেল দরিদ্রদের কথা। ধনীর দুলালেরা নষ্ট হচ্ছে ঘুষখোর,

Dhaka University Institutional Repository

উচ্ছৃঙ্খল, মদ্যপ, জুয়াড়. মাতা পিতার অযত্ন, অবহেলা, উদাসীনতা, স্নেহহীনতা, বিত্তবৈভবের প্রাচুর্যের কারণে। তাছাড়া ড্রাগ, ভিসিআর, ডিশ অ্যান্টেনার অনুপ্রবেশ, ধর্মীয় অনুশাসনের অভাব ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাও ঠেশে দিচ্ছে নগরের বিত্তবানদের সন্তানদের অপরাধকর্মে।

(৭) স্বাস্থ্যগত কারণঃ

কিশোর অপরাধের জন্য সামাজিক, রাজনৈতকি, অর্থনৈতিক কারণ ছাড়া স্বাস্থ্যগত কারণও দায়ী হতে পারে। মানসিক ও স্নায়ুরোগবিশেষজ্ঞগণের মতে, নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর কারণে একটি কিশোরের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা কাজ করতে পারে-

১.বার্থট্রমা: জন্মের সময় কোনো আঘাত পেলে নিচের কারণগুলোর জন্য এটি হতে পারে।

ক. ফোরসেপ ডেলিভারি,

খ. অপস্ট্রাকটেড ডেলিভারি,

গ. কর্ড ইনজুরি,

ঘ. অত্যধিক রক্তপাত,

ঙ. মেকোনিয়াম অ্যাসপিরেশন ও ফিট্যাল সিসট্রেস।

২. এছাড়া মায়ের অসুস্থতার কারণেও এটি হতে পারে। মা অসুস্থ হতে পারেন নিচের কতিপয় কারণে:

(৮) ডুয়েল ম্যাসেজ এফেক্ট ঃ

মা বললেন হ্যাঁ কিন্তু বাবা বললেন না- একজন কিশোরের এমন বিব্রতকর অবস্থায় পড়াকে মনোচিকিৎসকরা বলেন ডুয়েল ম্যাসেজ এফেক্ট। এমন অবস্থা একজন কিশোর-কিশোরীর জন্য দারুণ ক্ষতিকর। এমন অবস্থার শিকার হলে সেই বয়সী কিশোরেরা এক দ্বন্দ্বের অবদ্ধে আটকে পড়ে। তারা বুঝতে পারে না আসলে কোনটা সত্য বা মিথ্যা। কারণ একেই অবস্থায় দুটোই সত্য বা মিথ্যে হতে পারে না। তাই সে মানসিক বিপর্যয়ে পড়ে এবং এ থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

ডুয়েল ম্যাসেজ এর ধরন ভিন্নও হতে পারে। সাধারণত ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সী কিশোরদের এমন অবস্থা মোকাবেলা করতে হয়। কেননা এ বয়সী কিশোররা চট করে মুখের ওপর না বলতে পারে না। ওরা নীরবে নিজেদের কষ্ট দিতেই ভালোবাসে। তখন তাদের মাঝে একধরনের দুঃখ বিলাসিতাও কাজ করে। মাতা-পিতা বা অভিভাবকের কথা কষ্টের, অপমানের-অসন্তোষের হলেও অপারগতা সত্ত্বেও সেগুলো মেনে চলে।সাধারণ কিশোর অপেক্ষা কিশোরীরাই এ অবস্থার শিকার হয় বেশি। মেয়েদের দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি সেই মেয়েকে শিখিয়ে দেয় যে সে বড় হয়েছে। কিন্তু শারীরিক বৃদ্ধির সঙ্গে মানসিক বৃদ্ধিও প্রয়োজন। আর এর অভাব থাকলে সেই মেয়ে চিন্তা করে যে, সে তেমন একটি বড় হয়নি। তাই তারা মা-বাবার অনুশাসনমূলক বাধা-বিপত্তির মধ্যে সবচেয়ে বেশি পড়ে। এতে সে দারুণ বিষণ্নতায় ভোগে। নিজেকে জগৎ থেকে আলাদা মনে করতে থাকে। এক পর্যায়ে আত্মহত্যার মতো সিদ্ধান্ত পর্যন্ত নিয়ে বসে এবং তাতে সফল হয় অনেকে।

মা-বাবার দুজনের দুরকম বাক্য ব্যয়ে সন্তান আক্রান্ত হয়ে থাকে। যদি না বলতে হয় তবে ভালোভাবে যুক্তিসহকারে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। আর যদি হ্যাঁ করেন তাহলেও তাই।মনোরোগ বিশেষজ্ঞগণের মতে, অবসাদ, মাদকসক্তি, ভগ্নমনস্কতা সহ বহু মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে এমন পরিস্থিতিতে

পড়লে। মূলত অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে এমনটি হয়। তাই কিশোর-কিশোরীদের মনকে বুঝতে হবে। সব সময় না না বাক্য কারোরই ভালো লাগার কথা নয়। ওদের মনকে দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙ্গে দেয়া যাবে না। ওদের দ্বন্দ্বমুক্ত রাখতে হবে এবং যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ করে দিতে হবে। কখনো যেন মানসিক বিপর্যয় না ঘটে সেদিকে বিশেষ নজর রাখা জরুরি। ছেলেমেয়ে বিভেদ-বৈষম্য করা ঠিক না যা কিছু নিষিদ্ধ তা দুজনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে হবে।

(৯) সহনশীলতার অভাবঃ

আমাদের কিশোরদের মধ্যে সহনশীলতার অভাব দেখা দিয়েছে। যার কারণে তারা অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। এবং এটা কিন্তু তারা সমাজ থেকে শিখছে। শিশু-কিশোররা তাই শেখে যা সমাজ তাদের দেখায়। তারা সমাজে দেখে যে বেশি আক্রমণাত্নক সে বেশি ক্ষমতাশালী। যার কারণে কিশোররা সে রকম হতে চায়। সমাজের নেতিবাচক বিষয়গুলো তাদের মধ্যে ঢুকে যায়। টেলিভিশন, গেমসে ধ্বংস্নক জিনিস দেখে তারা সে দিকে আগ্রহী হয়। তারা অস্ত্র ধরতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। এ ছাড়া আরেকটি বিষয়, আজকাল কিশোররা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি দেখছে। যার ফলে নারীর প্রতি যে মর্যাদা বোধ তা তার লোপ পাচ্ছে। কারণ সে সব নারীকেই পর্নোগ্রাফির নারী ভাবতে শুরু করে। তার প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ বোধ করে। আর এ কারণে তারা রাস্তাঘাটে ইভটিজিং করে। এ ছাড়া পরিবারেরও একটা বড় দায়িত্ব আছে এ ক্ষেত্রে, শিশু যদি পরিবারে অশান্তি দেখে তবে তার মধ্যে ফ্রাস্ট্রেশন কাজ করে। যার কারণে শিশু আগ্রাসী হয়ে ওঠে। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে আমাদের সামাজিক শিক্ষণের প্রতি আরো বেশি নজর দিতে হবে। সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এক্ষেত্রে মিডিয়ারও ভূমিকা রয়েছে, এসব অপরাধ করলে যে সাজা হয় এটা অপরাধীদের জানাতে হবে। শাস্তির দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে হবে। তবেই তারা এ ধরনের অপরাধ করতে সাহস পাবে না। শিশু-কিশোরদের সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্যে আনা না গেলে এটা বাড়তে থাকবে। এ জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে শিশুদের দূরে রাখতে ভালো পরিবেশ ও ভালো গাইড দিতে হবে। অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে।

(১০) কিশোর নির্ধারণে আইনি জটিলতাঃ

কিশোর অপরাধ বিষয়ে যে প্রসঙ্গটি সামনে চলে আসে তা হলো- কিশোর বা শিশু বলতে কাদের বোঝায়? আমাদের দেশের বিভিন্ন আইনে এই শব্দযুগলকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সাবালকত্ব আইন, ১৮৭৫-এর তৃতীয় (৩) ধারা অনুযায়ী ১৮ বছর পূর্ণ হলে নাবালকত্বের অবসান ঘটে। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯৩৯ অনুসারে ২১ বছরের কম পুরুষকে এবং ১৮ বছরের নিচের নারীকে অপ্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। লেবার কোড, ২০০৬-এর ধারা মতে, যার বয়স ১৬ বছর পূর্ণ হয়নি তাকে শিশু বা কিশোর হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। দন্ডবিধির ৮২ ধারা অনুসারে নয় বছরের কম বয়স্ক শিশু কর্তৃক করা কোনো অপরাধই অপরাধ নয়। তবে চিলড্রেন অ্যাক্ট, ১৯৭৪-এর দ্বিতীয় ধারা অনুসারে অনূর্ধ্ব ১৬ বছরের কাউকে কিশোর হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কোনো কিশোরকে রাখার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দিতে পারে না উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোর তত্ত্বাবধায়ক বা সেখানকার কোনো পরিচালক। পুলিশের সুপারিশে আদালত সিদ্ধান্ত দেন অপরাধীকে শিশুবিকাশ কেন্দ্রে রাখার জন্য। এ কারণে অনেক সময় দেখা যায়, কিশোরদের সঙ্গে একই কক্ষে বাস করছে মধ্যবয়সি অপরাধীও। এতে করে অপারাধীরা শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের সুযোগ সুবিধা নিয়ে জেলের বাইরে থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির নির্বাহী পরিচালক অ্যাডভোকেট সালমা আলি বুধবারকে বলেন, আইনি এই জটিলতার কারণে আমরা নিজেরাও দ্বিধার মধ্যে পড়ে যাই। আমরা

বুঝে উঠতে পারি না, কোনো আইনের আওতায় এনে কাকে কিশোর বলা হচ্ছে। আর এই আইনি ফাঁক কাজে লাগিয়ে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয় থানা পুলিশ। আমরা চেষ্টা করছি এমন একটি আইন প্রস্তাব করার জন্য যাতে করে এসব আইনি জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

(১১) দাগি সন্ত্রাসীদের সহচার্যঃ

দেশের অধিকাংশ থানা ও কারাগারগুলোতে আটক সন্ত্রাসীদের সঙ্গে কিশোর অপরাধীদের রাখা হচ্ছে। ২০০৩ সালের ৯ এপ্রিল হাইকোর্ট এক রায়ে অন্য কয়েদিদের সঙ্গে কারাগারে কিশোর কয়েদিদের না রেখে পৃথক কোনো শেলার হোমে রাখতে নির্দেশনা দেয়। কিন্তু হাইকোর্টের এই রায়কেও অমান্য করে কারাগারে সন্ত্রাসীদের ও কিশোর অপরাধীদের একসঙ্গে রাখা হচ্ছে।সারাদেশের অধিকাংশ থানাতেই কিশোর অপরাধীদের আলাদা রাখার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। অপরাধ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কিশোর অপরাধীরা জেলের ভেতর সন্ত্রাসীদের সাহচর্যে থাকার কারণে ভবিষ্যতে আরো অপরাধ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

(১২) আইন থাকলেও প্রয়োগ নেইঃ

শিশু আইনে বিচারের আগে ও পরে শিশুদের জন্য কারাদন্ডকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শিশুদের বিচারাধীন সময়ে মুক্ত রাখার একমাত্র ব্যবস্থা হচ্ছে জামিন। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৯৭(১) অনুযায়ী ১৬ বছরের নিচে যে কোনো ছেলে বা মেয়েকে আদালত জামিন দিতে পারবেন। এমনকি সে যদি জামিন অযোগ্য অপরাধের অপরাধীও হয়। অন্য যে কোনো আইনের চেয়ে শিশু আইন এগিয়ে রয়েছে। আইনের ৪৮ ধারায় বলা হয়েছে, যে ক্ষেত্রে ১৬ বছরের কম বয়সী কেউ কোনো জামিন অযোগ্য অপরাধের কারণে গ্রেফতার হয়েছে এবং যদি সে মুহূর্তেই শিশুটিকে আদালতে পাঠানো সম্ভব না হয়, তবে সে ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা তাকে জামিন দিতে পারেন। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, আদালত কিংবা পুলিশ কর্মকর্তা কেউই শিশুদের জামিনে মুক্ত করার ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না।

(১৩) অন্যান্য কারণঃ

সামাজিক অসাম্য, দুঃখ-দুর্দশা, তদারকীর ঘাটতি, অবিচার, আশৈশব দুর্ব্যবহার প্রাপ্তি, কুসংস্কার ও কুসঙ্গ, প্রাকযৌন অস্থিরতা, প্রকাযৌন অভিজ্ঞতা, অসময়ে পিউবারটি, অপছন্দকর কর্মস্থান, অতি আদর বা অনাদর, আর্থিক অসচ্ছলতা বা আর্থিক প্রাচুর্য, অনিদ্রা, পরাশ্রয়, বিমাতা বা দূর আত্নীয়দের গলগ্রহ হওয়া, মাতা বা পিতার মালিকের গৃহে বসবাস, মালিক-তনয় দ্বারা নিগ্রহ ও অবজ্ঞা, অপুষ্টি, ভেজাল আহার বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের উপেক্ষা ও উপহাস, দ্বন্দ্বরত মন ও বিবিধ প্রদমিত মনোজট কিশোরের জন্য মারাত্নক ক্ষতিকর। এগুলো কিশোরদের উন্মাদ নির্বোধ ও অপরাধী করে তোলে যা জীবন প্রভাতে তাদের চরিত্রবান নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার পথে প্রবল প্রতিবন্ধক।

২.৫ কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে করণীয়ঃ

আগেই বলেছি যে, মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর অধ্যায় হলো কৈশোরকাল। এটি এমন এক সময় যখন একজন ব্যক্তি বয়স ও বুদ্ধি এ উভয়দিক থেকে ক্রমশ এগিয়ে যেতে থাকে বটে, তবে যথার্থ অর্থে বয়সী তথা প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে না। প্রাকৃতিকভাবে জীবনের এ সন্ধিক্ষণটি হয় স্বাপ্নিক ও কৌতূহলোদ্দীপক। এ সময়ে সে জানতে চায়, জানাতে চায়। জানতে ও জানাতে গিয়ে যদি বাধাগ্রস্ত হয় বা হোঁচট খায় তাহলে সে মূক ও বিমূঢ় হয়ে পড়ে, বিভ্রান্তি তাকে অপরাধী করে তোলে, নিয়ে যায় সর্বনাশার অতল গহ্বরে। অন্যদিকে যদি সে অবলীলায় জানতে পারে, জাতে পারে, উত্তর

Dhaka University Institutional Repository

পায়, মানসিক আশ্রয় ও অবলম্বন পায়, নৈতিক দীক্ষা ও প্রেরণা পায় তাহলে তার অগ্রগতি-অগ্রযাত্রার হয়ে ওঠে অনিবার্যভাবে সুন্দর, শাশ্বত ও সাবলীল ।এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোনোমানুষই অপরাধী হয়ে জন্মায় না । পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নানাবিধ কারণে আবেগ ও পরিবেশের নেতিবাচক প্রভাবে মানুষ অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে। সুতরাং কিশোর অপরাধীরা পেশাদার অপরাধীদের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত হচ্ছে তো অনুনন্ধানপূর্বক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন । এজন্য সবার আগে দরকার গ্রাম কিংবা শহর, পাড়া কিংবা মহল্লায় সর্বত্র ভালো পরিবেশ বজায় রাখতে শিক্ষিত সজ্জন ও অভিভাবক শ্রেণীর সম্মিলিত প্রয়াস । অধ্যয়ন, সৃজনশীলতা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা জরুরি । পরিবার, সমাজ ও স্কুলের পরিবেশ হওয়া দরকার আনন্দময় ও প্রণোদনাপূর্ণ ।

(১) কিশোর অপরাধ রোধে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ভূমিকা দরকারঃ

কিশোর অপরাধ একটি সামাজিক সমস্যা । আমরা যদি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কথা চিন্তা করি, তাহলে দেখা যায়, বাংলাদেশে এ অপরাধ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে । ১৯৮০ দশকের মাঝামাঝি সময় অভিভাবকরা সন্তানদের অবাধ্যতার কারণে প্রায়ই আদালতের দ্বারস্থ হতেন । সে সময় শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে মা-বাবা বাধ্য হয়ে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন । কিন্তু ১৯৬০ সালে এ অবস্থা ছিল না, তখন কোনো কিশোর আদালত ছিল না । ১৯৭৮ সালে ২০০ কিশোর অপরাধী রাখার উপযোগী কিশোর অপরাধ সংশোধনী কেন্দ্র নামে একটি প্রতিষ্ঠান টঙ্গীতে স্থাপন করা হয় । এ অপরাধীদের বেশির ভাগই ছিল অভিভাবকদের অভিযোগে অভিযুক্ত । কিন্তু বর্তমানে এ চিত্র পুরোপুরি বদলে গেছে । এখন ১০ ভাগ অভিযোগ আসছে অভিভাবকদের তরফে এবং বাকি ৯০ ভাগ অভিযোগই পুলিশের । কিশোর বয়সসীমা আইনত ১৬ বছরের নিচে ধরা হয় । কিন্তু বয়স ১৬ বছরের নিচে হলেও তাদের মানসিক বিকাশ বয়সসীমা অতিক্রম করেছে । ফলে সম্প্রতি তারা চুরি, ডাকাতি, খুন রাহাজানিসহ নানা অপরাধে জড়িয়ে যাচ্ছে । চাঁদা আদায়সহ বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়ছে, সেখানে সামান্যতম নিয়ন্ত্রণ থাকছে না মা-বাবার । বর্তমানে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ছে । তারাও নানা অপকর্মে জড়িত । তবে তাদের ক্ষেত্রে পুলিশ কেসের তুলনায় অভিভাবকের কেসের সংখ্যা হয়তো বেশি । তাদের অপরাধের ধরনটাও আলাদা । বয়োসন্ধিকালেই কিশোর অপরাধের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে । বর্তমান আকাশ সংস্কৃতির যুগে ছেলেমেয়েরা অনেক কিছুর সঙ্গেই পরিচিত হচ্ছে । যেসব জিনিস জানার প্রয়োজন নেই, সেসব বিষয় জানার সুযোগ পাচ্ছে তারা । তাতে বিভিন্ন ধরনের অপকর্মে আসক্ত হচ্ছে প্রতিনিয়তই । ফলে নানা মাদকাসক্তি, সেক্স অফেন্স এমনকি খুনের মতো কাজেও তারা প্রলুব্ধ হচ্ছে । এসব কাজ করার পেছনে যে স্পৃহা কাজ করে সেটা অনেকটা থ্রিল বা অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে তুলনা করা যায় । দরিদ্র জনগোষ্ঠী, স্থানান্তরিত হয়ে যারা শহরে বাস করে তাদের অধিকাংশই লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত । অনেক ক্ষেত্রে অল্প বয়সে কর্মে নিয়োজিত এবং তারা ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা পায়নি । তাদের ক্ষেত্রেও অপরাধের প্রবণতা প্রবল রূপ ধারণ করছে । অন্যদিকে তাদের দৈহিক ও সামাজিক বিকাশ যেভাবে গড়ে উঠছে তাতে তাদের চাহিদাও অভিভাবকরা ঠিকমতো পূরণ করতে পারে না । ফলে তারা নিজেদের অসহায় মনে করে এবং সমাজও তাদের সেভাবে গ্রহণ করে না । এ জনগোষ্ঠীর সংখ্যাও কম নয় । রাস্তাঘাট, ফুটপাত, পার্ক, খোলা জায়গা বা বস্তিতে বাস করে তারা । এ শ্রেণীর মানুষের জন্য বিশেষ প্রকল্প হাতে নেওয়া দরকার । তাদের জন্য কর্মসংস্থান প্রয়োজন । এ ক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ভূমিকা খুবই জরুরি ।

(২) পরিবারের দায়িত্বঃ

শিশু-কিশোরদের কাদামাটির সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। শিল্পী কাদামাটিকে যেভাবে রূপ দিতে চান, সে রূপেই গড়ে তুলতে পারেন। বস্তুত, শিশু-কিশোররা কাদামটির মতোই কোমল। পরিবার ও সমাজ জীবনের পরিপার্শ্বের মধ্যে তারা বেড়ে ওঠে। সভ্যতার প্রথম সোপানই হলে পরিবার সংগঠন। দয়া, মায়া, প্রেম-ভালোবাসা অপরের প্রতি সৌজন্যবোধ, সহনশীলতা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তিগুলোর বিকাশের উপযুক্ত শিক্ষালয় হচ্ছে পরিবার। পরিবারকে বলা যায়, মানব জীবনের প্রধান বুনিয়াদ ।তাই সুষ্ঠুভাবে শিশু-কিশোরের ব্যক্তিত্ব বিকাশে এবং কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে একটি সুসংহত পরিবার এবং পারিবারিক দায়িত্ব অপরিসীম। অস্বীকার করার জো নেই যে, নৈতিক শিক্ষার ভিত এখানেই রচিত হয় যা আজীবন টেকসই হতে পারে। এ প্রসঙ্গে নিম্নে কয়েকটি দিকের প্রতি আলোকপাত করা হলো-

ক. নিয়ন্ত্রণ: শিশু-কিশোরদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা তাদের কার্যকলাপ একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিবদ্ধ রাখে এবং সীমার বাইরের কাজ করলে তা অন্যায়ের পর্যায়ে পড়বে, এ বোধ তৈরি হয়।

খ. বোধজ্ঞান: শিশু-কিশোরদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট নৈতিক মানের সৃষ্টি করতে হবে। স্বাভাবিক উচিত, অনুচিত, ভালোমন্দের সাধারণ প্রভেদ তাকে বুঝতে দিতে হবে।

গ. সাহায্য: মাতা-পিতাকে প্রত্যেক শিশু-কিশোররের আস্থাভাজন হতে হবে। সন্তানেরা যাতে নিজের ও অন্যের উপকার করবার মানসিকতা অর্ন রতে পারে তার জন্য তাকে সাহায্য করতে হবে।

ঘ. বিশ্বাস: কাকে বিশ্বাস করা উচিত এবং কাকে বিশ্বাস করা অনুচিত এসব সম্পর্ক তাকে অবহিত করা প্রয়োজন।

ঙ. স্বাধীনতা: একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে কিশোরদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া প্রয়োজন এবং অপরিহার্য নাহলে তাদের কোনো কাজের প্রতিবন্ধক হওয়া অনুচিত।

চ. ভালোবাসা: কিশোররা যেন অনুভব করে যে, তাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতার অসীম ভালোবাসা ও গভীর দরদ রয়েছে এবং এ ভালোবাসায় আছে তাদের প্রতি তাদের মাতাপিতার সমতা নীতি।

ছ. প্রশংসা: কিশোরদের প্রতিটি সুন্দর ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং প্রশংসা করতে হবে। তাদেরকে উৎসাহ দেয়া দরকার, তবেই তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জন্ম নেবে। মাতা-পিতার বলা উচিত আমি জানি এটা তুমি করতে পারবে। তারপর হয়তো বলা হলো, জানতাম, তুমি পারবে ইত্যাদি। কোনও সাফল্যই অভিনন্দন জানানোর জন্য ক্ষুদ্র নয় ।কখনও কাজে সফল না হলে সমালোচনা করতে হবে, তবে প্রশংসাসহ। ছেলে যদি ফুটবল খেলতে গিয়ে গোল করতেনা পারে, তাহলে তাকে বলা উচিত, তুমি যেভাবে ড্রিব্ল (Dribble) করলে তা অসাধারণ ছিল। কালকে আরএকটু ভালো করে প্র্যাকটিস করো। এভাবে তাদের ছোটখাট সাফল্যকে মূল্য না দিলে তাদের জীবনে দ্বন্দ্ব ঘিরে আসবে। কোনো লক্ষ্যেই পৌঁছতে পারবে না ওরা। পায়ের নিচে জমি নড়বড়ে হয়ে যাবে।

জ. রক্ষা কার্য: কিশোররা যেন বিশ্বাস করে যে, মাতা-পিতা তাদের বিপদের বান্ধব, সর্বোপরি সবসময়ের অকৃত্রিম রক্ষাকবচ।

Dhaka University Institutional Repository

ঝ. নিরাপত্তাঃ কিশোররা যেন উপলব্ধি করে যে, তাদের ঘর তাদের জন্য সর্বোত্তম আশ্রয় ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান।

ঞ. সংযমঃ ব্যবহার, কাজকর্মসহ বিভিন্ন বিষয়ে কতটা পর্যন্ত এগুনো উচিত, কী পরিমাণে একটি কাজ করা উচিত, কখন ও কেন একটি কাজ পরিহার করা উচিত ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাথমিক পরিমিতিবোধ ও তৎসম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞান তাকে দিতে হবে।

ট. প্রশ্নোত্তর দানঃ শিশু-কিশোরদের প্রতিটি প্রশ্নের সদুত্তর দেয়া উচিত। জার্মান শিক্ষাবিদ Friedrich Froebel (১৭৮২-১৮৫২) এর একটি উপদেশ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, হে শিশুর পিতা, শিশুর প্রতি কঠোর হয়ো না। তার পুনঃপুনঃ প্রশ্নবাণে অস্থিরতা প্রকাশ করো না। প্রতিটি কঠোর শব্দের আঘাত তার জীবন ফুলেরপাপড়ি নষ্ট করে দেয়। জীবন তরুণের শাখা বিনষ্ট করে ফেলেকিশোরদেরকে সরল ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় বোঝাতে হবে। কথা অপেক্ষা ঘটনা ও দৃষ্টান্ত তাদেরকে প্রভাবিত করে বেশি। তারা অনুকরণপ্রিয়। সুতরাং মাতা-পিতাকে তাদের সামনে মিথ্যাচার, ভণ্ডামী বা
নৈতিকতাবর্জিত আচরণ হতে বিরত থেকে নিজেদেরকে অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করতে হবে। মাতা-পিতা হবেন সন্তানের কাছে একজন সৎ ও সুন্দর মানুষের প্রোজ্জ্বল প্রতিভূ।

ঠ. আবিষ্কার করতে দেয়াঃ একবার এক ঘন বৃষ্টির পর একটি কিশোর বাবার কাছে দৌড়ে এলো– দ্যাখো বাবা কী সুন্দর পাথর। বাবা তো কোনও পাত্তাই দিলেন না, বরং রাগ করলেন, কী সব সময় যে কাদা ঘাঁটো! কিশোরটির মুখ শুকিয়ে গেল। বাবা যদি ছেলের এ প্রয়াসকে অভিনন্দন জানিয়ে বলতেন, বা কী সুন্দর! কেথা থেকে পেরে আরও ভালো পেতে পারে! ইত্যাদি। তাহলে ছেলেটি আরও উৎসাহিত হতো। নতুন কিছু করার আনন্দ পেত, জীবনে বৃহত্তর ক্ষেত্রে এগোনোর সুবিধা হতো।

ড. সন্তানের স্বপ্ন সম্বন্ধে জানাঃ মাতা-পিতা দেখলেন তাদের কিশোর ছেলেটি খেলোয়াড় হতে চায়। কিংবা কিশোরী মেয়েটি হতে চায় বিমানের পাইলট যা মাতা-পিতার অপছন্দ। এক্ষেত্রে ওদেরকে ভর্ৎসনা করার আগে পুরো ব্যাপারটি ভালোভাবে জানা প্রয়োজন। তাই ওদের পছন্দের পেশার খোঁজখবর নিতে হবে, সেগুলোর ভবিষ্যৎ জানতে হবে। মাতা-পিতার অপছন্দ হলো ওদের পছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে পুরো ব্যাপারটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করতে হবে।এখানে এটি বলা হচ্ছে না যে, কিশোর-কিশোরীর সব ইচ্ছেকে বিনা বাক্যে যাচাই-বাছাই ছাড়াই মেনে নিতে হবে। যাচাই বাছাই অবশ্যই করতে হবে। তবে ওদের আবেগ-অনুভূতি-চিন্তা-রুচি ইত্যাদিকেও সহানুভূতির সাথে বিশ্লেষণ করে দেয়া প্রয়োজন।

(৩) বিদ্যালয়ের ভূমিকাঃ

কিশোর-কিশোরীরা দিবসের একটি উল্লেখযোগ্য সময় ধরে বিদ্যালয়ে অবস্থান করে। বিদ্যালয়ের রীতিনীতি, আচরণ, শৃঙ্খলা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ব্যবহার, দৃষ্টিভঙ্গি, সিলেবাস কারিকুলমা ইত্যাদি কিশোর-কিশোরীদের মানস গঠনে গভীর প্রভাব ফেলে। একটি বিদ্যালয়ের রীতিনীতি আচরণ-শৃঙ্খলায় যদি সভ্যতা, ভব্যতা, নিয়মানুবর্তিতা, সমতা ইত্যাদিসহ নানামুখী সুস্থ সংস্কৃতির নিয়ত চর্চা ও প্রাত্যহিক অনুশীলন ঘটে তাহলে কিশোর-কিশোরীরা ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হতে বাধ্য। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ । তাঁদের চরিত্র-মাধুর্য, চিন্তা-চেতনা, আচার-ব্যবহার, রুচি-লেহাজ, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি দ্বারা কোমলমতি শিক্ষার্থীরা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। সুতরাং শিক্ষক যদি চত্রিবান না হন, সুন্দর স্বভাবের অধিকারী না হন, সমতা ও সমদর্শিতার গুণে গুণান্বিত হয়ে না ওঠেন, সর্বোপরি শিক্ষার্থীর

Dhaka University Institutional Repository

মনোরাজ্যে একটি নির্মল আসন প্রতিষ্ঠা করতে না পারেন তাহলে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর কাছ থেকে নিছক পাঠ্য পুস্তকের বাইরে জীবন গঠনের কোনো দীক্ষা লাভ করতে পারবে না। সুতরাং সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং আদর্শ ও চরিত্রবান শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন। পাশাপাশি স্কুল-মাদ্রাসার সিলেবাস কারিকুলামকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শিশু-কিশোরদের মাঝে একগুচ্ছ অভিন্ন নৈতিক মূল্যবান মুল্যবোধ তৈরিতে সহায়ক হয়, হয় জীবনমুখী।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় রয়েছে বৈষম্যের ছড়াছড়ি। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব বোধের জাগরণ এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রীবন্ধন। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এক্ষেত্রে হাঁটছে বিপ্রতীপ পথে। এ জায়গাটিতে প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি সংস্কার। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার অসম্ভব বাংলাদেশ বিরাজমান। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংরাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ স্কুল, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, ক্যাডেট কলেজ, মাদ্রাসা ইত্যাদির ধারা-উপধারা মিলে মোট তের ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে। সন্দেহ নেই যে, শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তক, কারিকুলাম, শিক্ষা পদ্ধতি, সংস্কৃতি একেক রকম। ফলে ওরা একে অপরের সাথে স্বচ্ছন্দে মিশতে পারে না, মন খুলে কথা বলতে পারে না। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, একশ্রেণীর অভিভাবকও এতে উৎসাহ যোগান। এভাবে ক্রমশ একজন শিক্ষার্থী অন্যদের থেকে নিজেকে আলাদা ভাবতে শুরু করে। সৃষ্টি হয় অতি শৈশবেই বৈষম্য সৃষ্টিকারী মানসিকতা। এ মানসিকতা শিশু-কিশোরকে সমতা, একতা, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদির পরিবর্তে নিজের অজান্তেই অপরাধমনস্ক অথবা অনুচিত হীনমনা করে তুলতে সহায়ক হয়। কাজেই এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করার জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত একটি একমুখী সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজন।

(৪) প্রতিকারে চাই বিশেষ ব্যবস্থাঃ

কিশোর অপরাধ বৃদ্ধির সাম্প্রতিক প্রবণতায় উদ্বিগ্ন না হয়ে উপায় নেই। ভিডিও গেমস নিয়ে কথা কাটাকাটির কারণে স্কুল সহপাঠীকে হত্যা করা থেকে শুরু করে সেমিস্টার ফি জোগাড় করতে বন্ধুকে খুনথ এসব খবর আমরা পত্রিকার পাতায় হরহামেশাই দেখছি। এ ছাড়াও কিশোরদের মধ্যে মাদক সংক্রান্ত অপরাধ যেমন মাদক ব্যবসায় জড়িত হওয়া, অবৈধ অস্ত্র বহন ও ব্যবহার, গাড়ি চুরি, পকেটমার, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, অপহরণ, হত্যাপ্রচেষ্টা ও বোমাবাজিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। এ বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে ভবিষ্যতে কিশোর অপরাধ নতুন একটি সামাজিক ব্যাধি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে।কিশোর অপরাধী তাদেরকেই বলা হয় যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক কিন্তু এমন একটি অপরাধ সংঘটিত করেছে যেটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য আইনের দৃষ্টিতে দণ্ডনীয়। বিভিন্ন দেশে আইনের মাধ্যমে কিশোর অপরাধের এ বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়। যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এ বয়সসীমা ১০ বছর হলেও জাতিসংঘের শিশু সংস্থা ইউনিসেফ এটি ১২ বছর করার পক্ষে। আমাদের দেশে ২০০৪ সালে এ বয়সসীমা ৭ থেকে ৯ বছরে উন্নীত করা হয়েছে, যেটি জাতীয় শিশুনীতিতে আরও বাড়ানোর চেষ্টা প্রক্রিয়াধীন। সারাবিশ্বে কিশোর অপরাধের মাত্রা উদ্বেগজনকভাবে শতকরা ৫০ ভাগ বেড়ে যায় নব্বই দশকের মাঝামাঝি থেকে। আমাদের দেশে কিশোর অপরাধ সংক্রান্ত জাতীয় পরিসংখ্যান না থাকলেও অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ (২০০৮) পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, আমাদের দেশের বিভিন্ন কারাগারে ১৯৯০ সালে কিশোর অপরাধীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৪ জন, যা ২০০০ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৫৭৪ জনে। বর্তমানে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও এ সংখ্যা দ্রুত গতিতে বেড়েই চলছে । কিন্তু এসব পরিসংখ্যান আমাদের দেশের কিশোর অপরাধের শুধু আংশিক চিত্র বহন করে; কোনোভাবেই পুরোটা নয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন দেশে কিশোর অপরাধকে শহুরে বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হলেও এর ব্যাপ্তি শহর, গ্রামাঞ্চল ও আর্থসামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সব জায়গায় বিস্তৃত। অপরাধ সংঘটনে বৈচিত্র্য থাকলেও বিষয়টি সর্বজনীন। আমাদের দেশের চিত্রও প্রায় একইরকম। কিশোর অপরাধকে এক সময় বখে যাওয়া ক্ষুদ্র উপদলীয় বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হলেও বর্তমানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপাদান যেমন জিনেটিক বা বংশগতি, ব্যক্তিত্বের ধরন, বেড়ে ওঠার পরিবেশ, অভিভাবকত্বের ধরন, পরিবার ও আর্থসামাজিক বিষয়কে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রে সামাজিক কাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন, পুঁজিবাদী সভ্যতার সৃষ্ট ভোগসর্বস্ব সমাজ, ন্যূনতম সুবিধাবঞ্চিত কৈশোর, নৈতিক মূল্যবোধর অবক্ষয় অনেকাংশে দায়ী। দলগত অপরাধ ছাড়াও কিশোর অপরাধ এককভাবে ও ধ্বংসাত্মক পর্যায়েরও হতে পারে। বর্তমানে সমাজে শিশু-কিশোরদের সুস্থ বিনোদন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের পরিবর্তে ভিডিও গেমস, কম্পিউটার ও ইন্টারনেটে বেশি আসক্তি লক্ষ্য করা যায়। সমাজ পরিবর্তনের এ ধারাটিও কিশোর অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এক গবেষণায় দেখা গেছে, কিশোর অপরাধীদের দুই-তৃতীয়াংশের বয়স ১২ থেকে ১৬ বছর এবং বেশিরভাগ ছেলে। কিন্তু বর্তমানে কিশোরীদের মাঝেও অপরাধপ্রবণতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিশোর অপরাধের কারণের বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। অনেকে মনে করেন, একবার অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেলে তার আর ফেরার উপায় থাকে না। আবার বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ক্ষুদ্র উপদলের সংস্রবে এসেও কিশোররা অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। অনেকে বলে থাকেন, অপরাধপ্রবণতা বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয়। শিশু-কিশোরদের প্রতি সহিংসতা, নিচু মানের পারিবারিক সম্পর্ক, যেমনথ দাম্পত্য কলহ, ডিভোর্স ও পারিবারিক নির্যাতন তাদের অপরাধপ্রবণতা আরও বাড়িয়ে তোলে। কিছু মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা, যেমনথ আচরণগত সমস্যা, পড়াশোনায় অমনোযোগিতা, অতিচঞ্চলতা, সহিংস আচরণ, সাধারণের তুলনায় কম বুদ্ধি, বিষণ্নতা, মাদকাসক্তি প্রভৃতি কিশোর অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এ জন্য কিশোর অপরাধীদের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মনোসামাজিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ অবস্থা নিরূপণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিশোর অপরাধ সংঘটিত হলে আদালত থেকে তাকে চিকিৎসার জন্য, সংশোধনাগারে পাঠানো কিংবা সতর্ক করে ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক আসামির সঙ্গে রাখা বা তাদের মতো বিবেচনা করা যাবে না। কিশোর অপরাধীদের ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাদের ভেতর পুনর্বার অপরাধ করার প্রবণতা হ্রাস করা। আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী কিশোর অপরাধীদের প্রচলিত আদালতের পরিবর্তে কিশোর অপরাধের জন্য বিশেষ কিশোর আদালতের ব্যবস্থা করতে হবে, যেখানে কিশোরদের পর্যাপ্ত সহযোগিতার মাধ্যমে তার আচরণ সংশোধনের সুযোগ থাকতে হবে। এখানে মূল বিষয়টি হচ্ছে তাকে শাস্তির পরিবর্তে সঠিক পথে বিকশিত হওয়ার সুযোগ প্রদান করা। অনেক সময় কিশোর সংশোধনকেন্দ্রের পরিবর্তে শুধু অভিভাবকদের সতর্ক হয়ে মনোসামাজিক সহায়তা গ্রহণ, অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ, আবাসিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। সে সঙ্গে মনেচিকিৎসক ও মনোবিদের সহায়তায় তাদের বিদ্যমান মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের দেশে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কিশোরদের জন্য গাজীপুর ও যশোরে দুটি এবং কিশোরীদের জন্য গাজীপুরে একমাত্র কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। এসব কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিদ্যমান কেন্দ্রগুলোর সেবার মান বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় লোকবল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে জতিসংঘ নীতিমালা (রিয়াদ গাইডলাইন ১৯৮৮) অনুযায়ী যে কোনো সমাজে অপরাধ দমন নীতিমালায় কিশোরদের জন্য পৃথক ও বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে হবে। আমাদের জাতীয় শিশুনীতিতেও বিষয়টির অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। অপরাধের মামলায় যে শিশু হাঁটতে পারে না তাকে তার পিতার কোলে চড়ে আদালতে গিয়ে জামিন নেওয়ার ঘটনাও আমরা পত্রিকায় দেখেছি। এসব

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ের আশু সুরাহা প্রয়োজন এবং কিশোর আদালতের কাজের পরিধি বাড়ানো প্রয়োজন। কিশোরদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষা, খেলাধুলা, স্কাউটিং ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ তৈরি করতে হবে। সে সঙ্গে তাদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। এতে তারা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে সৃজনশীল কাজে বেশি উৎসাহী হবে। যুব উন্নয়ন কর্মসূচিকে আরও বেগবান করা প্রয়োজন। শিশু-কিশোরদের সুস্থ পারিবারিক পরিবেশে, স্কুল ও কমিউনিটিতে বেড়ে ওঠার সুযোগ তৈরি করতে হবে। তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে না পারলে আমাদের জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত হবে। কিশোর অপরাধ প্রতিরাধে সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণের সময় এখনই।

সূত্রঃ রিয়াদ গাইডলাইন (http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r112.htm)

(৫) কিশোর অপরাধ রোধে চাই দর্শনমুখী শিক্ষাঃ

কিশোর অপরাধ বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে বাড়ছে মহামারী আকারে। ফুটপাতের টোকাই থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত ঘরের স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা কেউই বাদ যাচ্ছে না। বাংলাদেশ পুলিশের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী এ দেশে কিশোর অপরাধীর সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ, যা ২০১৪ সালের মধ্যে সাড়ে ১১ লাখে গিয়ে ঠেকবে। বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪ অনুযায়ী, ১৬ বছর পর্যন্ত শিশুকাল। এ সময়টা মূলত স্কুল-কলেজে কাটানোর সময়। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্কুল-কলেজের এই খুদে শিক্ষার্থীরাই জড়িয়ে পড়ছে নানা ভয়ংকর অপরাধে। নিছক তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হচ্ছে খুন অহরহ। এ ছাড়া মাদক, ছিনতাই, অপহরণ, ইয়াবা, অঙ্গহানী করা ইত্যাদি যেন ছায়ার মতো লেগে আছে আমাদের স্কুল-কলেজ পড়ুয়া কিশোরদের সঙ্গে। এসব অপরাধের ফিরিস্তি লিখে শেষ করা যাবে না। দু-একদিন পরপরই এক একটি ঘটনা ঘটে, আর আমরা কিছুদিন লাফলাফি করি। অপরাধবিজ্ঞানীর মতে, অপরাধীর অপরাধ করার পেছনে কাজ করে তার সামাজিক পরিবেশ ও মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ। আর এ দুটি বিষয়ের সুস্থ উন্নয়নে বিদ্যালয় ও শিক্ষা কাঠামোর ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।মানুষের জীবনের হাজারো জগতের ভেতর একটি হচ্ছে তার নৈতিকতা ও আদর্শের জগৎ। প্রতিটি মানুষের ভেতর এ জগৎ অস্তিত্বশীল। যার নৈতিকতার জগৎ যত শুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন সে তত ভালো মানুষ। এ জগতের মাধ্যমে সে বুঝতে পারে ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, আলো-অন্ধকার তথা সার্বিক মূল্যবোধ। এ জগতের মাধ্যমে একটি কিশোর বেড়ে ওঠে দার্শনিক ও চিন্তাশীল মনোবৃত্তি নিয়ে। এখন সময় এসেছে ভাবনার, আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা কতটুকু দর্শনমুখী? কৈশোরে যদি নৈতিকতা, আদর্শ আর মূল্যবোধের বীজ বপন করা না যায় তবে সারা জীবনে তা হয়তো অনেকের মনেই জেগে ওঠে না। আর যদি তা না ওঠে তবে মানব মন থেকে মানবতা, ভালোবাসা, সংযম আর সুন্দরের বিলোপ ঘটবে। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে গিয়েছিলেন, 'নীতিশিক্ষার উচিত উপায় হচ্ছে, কর্তব্য ও পবিত্রতার সৌন্দর্য বাল্যাবস্থায় মনের মধ্যে ফুটাইয়া তোলা। পবিত্রতা, সত্য, দয়া, অহিংসা ইত্যাদিকে যদি হৃদয় মধ্যে সংস্কাররূপে বদ্ধমূল করিতে চাহ তো এই-সব গুণের সৌন্দর্য পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতে হইবে এবং তাহা হইলেই মন আপনা হইতেই এদিকে আকৃষ্ট হইবে। অপবিত্রতা, রাগ, দ্বেষ, হিংসা যে কতদূর কুৎসিত তাহাই দেখাইতে হইবে।' আর এই নৈতিক মূল্যবোধ বাস্তবায়নের জন্য চাই স্কুল পর্যায় হতে দর্শন চর্চা ও নীতিবিদ্যার বাস্তব শিক্ষা। সরকার এ বছর (২০১২) নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত করার লক্ষ্যে কম্পিউটার শিক্ষা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছে, বিতরণ করেছে কম্পিউটার ও প্রযুক্তি বিষয়ক বোর্ড বই ষষ্ঠ হতে নবম শ্রেণী পর্যন্ত, যা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। কিন্তু চলমান সংকট কিশোর অপরাধ দূরপূর্বক আজকের কিশোর-তরুণ সমাজকে নৈতিক, যৌক্তিক ও মূল্যবোধসম্পন্ন মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে দর্শন শিক্ষা কি কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল? চাইলে কি হতে পারত না দর্শন ও

নীতিবিদ্যা বিষয়ক নতুন কোনো ডিসিপ্লিন?কিশোরের শুদ্ধ মানসিক বিকাশ কমিয়ে আনতে পারে কিশোর অপরাধ ও হিংস্র কর্মকা- । আর বিকাশের জন্য চাই শুদ্ধ সাংস্কৃতিক চর্চা । আজকে আমাদের চারপাশে যে অশুদ্ধ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চলছে তাও অনেক ক্ষেত্রে শিশু-কিশোদের সাইকি বানিয়ে দিচ্ছে । শেক্সপিয়ার বলেছিলেন, 'যে গান শুনে না সে মানুষ খুন করতে পারে ।' আল-কিন্দ (৮১০-৮৭১) নামের এক বিশিষ্ট দার্শনিক, চিকিৎসক ছিলেন সংগীত শুনিয়ে রোগীকে সুস্থ করে তুলতেন । সুতরাং গানেরও ভূমিকা আছে, যে গান কিশোরদের মনে ভাবনার খোরাক জোগাবে, চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত করবে, নিজেকে নিয়ে ভাবনার প্রয়াস দেবে সেগুলোর সঙ্গে শিশু-কিশোরদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে, তাহলেই তাদের মধ্যে মানবিকতার বীজ অঙ্কুরিত হবে । রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ডি এল রায়সহ যেসব খ্যাতিমান শিল্পীর গানে দর্শন আছে তা স্কুল-কলেজগুলোতে নিয়মিত চর্চা হওয়া উচিত । এটাও শিক্ষা ও বিবেকমান মানবসম্পদ গড়ার অংশ । সর্বক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব অনেক ক্ষেত্রে কিশোরদের অপরাধী করে তোলে । অনেক অভিভাবক বাড়িতে বা শিক্ষকরা ক্লাসে সর্বদা সহপাঠী বা বন্ধুর সঙ্গে প্রতিযোগী মনোভাব পোষণে অনুপ্রাণিত করেন । এতে কিশোররা ত্যাগ ও সংযমের দর্শন ভুলে ভোগের মানসিকতায় বেড়ে ওঠে । ফলে একটি মোবাইল ফোন, নেশার টাকা অথবা কোনো মেয়ের জন্য সহপাঠী সহপাঠীর গলায় ছুরি বসাতেও হাত কাঁপছে না । অন্যের ভালো, মঙ্গল ও সুন্দরকে সুন্দর চোখে দেখার মানসিকতায় কিশোরদের গড়ে তোলার দায়িত্ব পরিবার, বিদ্যালয় ও গোটা সমাজের ।চার্লস ল্যাম্ব বলেছেন, 'যে বই পড়ে তার কোনো শত্রু নেই'থ কথাটি কতটুকু সত্য তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও বই যে কিশোরদের অন্তত একটা নিরাপদ জগৎ দেয়, এ নিয়ে বোধ হয় কারো সংশয় থাকার কথা না । যেই শিশু বা কিশোরটির বইয়ের নেশা আছে তাকে মাদকের নেশা স্পর্শ করে না, যে কিশোর অবসর সময়ে বিখ্যাত কোনো ব্যক্তির জীবনী পড়ে সে পাড়ার মাস্তান, অসভ্য বা দুষ্ট বন্ধুর সঙ্গে মিশতে পারে না । অধিকাংশ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে এখন পাঠাগার চর্চা উঠে গেছে বললেই চলে । প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে অভিভাবক পর্যন্ত সবাই এখন জিপিএ কুড়ানোর তালে আছেন । বিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যবই বাদে বিভিন্ন চিন্তাশীল পাঠক গঠনমূলক, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টিশীল বই থাকা উচিত । বিদ্যালয়ের উদ্যোগে বছরে দু-একবার বই পাঠ উৎসব কিশোরদের মনে বই পাঠের অনুপ্রেরণা দেবে । এতে তারা বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার জগৎ পাবে, জগৎ ও জীবনের সন্ধান পাবে, এতে করে কিশোররা হিংস্র হবে না, সহমর্মিতা ও ভালোবাসা শিখবে । সেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে বসে রবিঠাকুর বলে গিয়েছিলেন, 'যদি পবিত্রতা কতদূর সুন্দর ও অপবিত্রতা কতদূর কুৎসিত ইহা হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করাইতে চাহ তো বরং ভালো নভেল ও কবিতা পড়িতে দাও । টেক্সটবুক-এর সহিত হৃদয়ের কোনোই সংস্রব নাই ।'শিশু-কিশোররা সর্বদাই অনুকরণপ্রিয় । যা মানুষকে করতে দেখে তাই তার কাছে স্বাভাবিক মনে হয় । কিশোররা হিংস্র দৃশ্য, ফাইটিং ভিডিও গেম, ভয়ঙ্কর দৃশ্য বিশেষত অ্যাকশন মুভি, হরর ফিল্ম ইত্যাদি প্রতিনিয়ত দেখার ফলে আরো হিংস্র হয়ে উঠছে । আমাদের দেশে কিশোরবান্ধব ফিল্ম নেই বললেই চলে, ফলে কিশোররা তাদের বিনোদন চাহিদা মিটায় এসব মানসিক বিকাশের প্রতিকূল এমন সব প্রোগাম দেখে, যা তাদের দর্শনবৃত্তির অন্তরায় । জগৎখ্যাত দার্শনিক নোবেল জয়ী বার্ট্রান্ড রাসেলের কথা দিয়ে শেষ করব, 'ছেলেকে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা শিখান সে যেন আপনাকে কোনো প্রাণী এমনকি বোলতা বা সাপ মারিতেও না দেখে সে যদি অপর ছোট শিশুর প্রতি নির্দয় ব্যবহার করে, আপনিও তাহার প্রতি সেইরূপ করুন । সে প্রতিবাদ করিবে; আপনি তখন তাহাকে বুঝাইবেন যে, সে যদি ইহা পছন্দ না করে, অন্যের প্রতিও তাহার নিষ্ঠুর আচরণ করা সঙ্গত নহে ।

(৬) টিএনজ আত্মহত্যা রোধে ভূমিকাঃ

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বে প্রতিবছর কেবল ৪০ লাখ কিশোর-কিশোরী আত্নহত্যার চেষ্টা করে। দেশে দেশে এ বয়সে আত্নহত্যার হার তারতম্য দেখা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, কিশোর-কিশোরীদের আত্নহত্যার পেছনে অনেক কারণ জড়িত রয়েছে। যেমন জেনেটিক, হরমোনাল, আবেগপ্রবৃত্ত ও পরিবেশগত কারণ। আত্নহত্যার কয়েকটি ঝুঁকিপূর্ণ কারণ হচ্ছে বিষণ্নতা দৈহিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন, উগ্রতা ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচার। উল্লেখ্য যে, আত্নহননের অনুভূতি ও ডিপ্রেশনের উপসর্গের মাঝে মিল রয়েছে। কিশোর-কিশোরীর নিচের উপসর্গগুলোর প্রতি মাতা-পিতাকে নজর রাখতে হবে

ক. ঘুম ও খাওয়ার অভ্যাস বদলে যাওয়া। শরীরের ওজন কমে যাওয়া।
খ. দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়া বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করা, পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকেও আলাদ থাকা।
গ. প্রতিদিনের কাজকর্ম থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখা এবং উৎসাহে ভাটা পড়ো।
ঘ. সহিংস প্রতিক্রিয়া, বিদ্রোহী আচরণ, ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রবণতা, আক্রমণাত্নক ভঙ্গিমায় ঘনিষ্ঠজনের প্রতি ছুটে আসা ইত্যাদি।
ঙ. মাদকের নেশায় জড়িয়ে যাওয়া।
চ. চোখে পড়ার মতো ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন। কথা বলা বা চলাফেরায় অস্বাভাবিক গতি, হয় খুব দ্রুত অথবা ধীরে।
ছ. সব সময় মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যববোধ বা বিরক্তিভাব নিয়ে থাকা, মনোযোগের ঘাটতি, স্কুলে দক্ষতায় পিছিয়ে যাওয়া।
জ. আবেগের সঙ্গে সম্পর্কিত দৈহিক উপসর্গ যেমন মাথাব্যথা, পেটব্যথা, অবসাদ ইত্যাদি নিয়ে সব সময় সেঁটে থাকা।
ঝ. আনন্দময় কাজে আনন্দ খুঁজে না পাওয়া।
ঞ. প্রশংসা বা পুরস্কার কোনটিই সহ্য না করা।
ট. সব সময় নিজের খারাপ দিক নিয়ে কথা বলা, নিজেকে খারাপ ভাবা, অনুভূতির ঘুরপাকে নিজেকে আটকে ফেলা।
ঠ. আত্নহতার ব্যাপারে মৌখিক সঙ্কেত দেয়া যেমন্তুতোমাদের আর বেশি জ্বালব না, আর বেশি দিন নেই আমি ইত্যাদি।
ড. নিজের প্রিয় সব কিছুতেই অনীহা, গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলা।
ঢ. বিষাদের একটি সময়ের পর আচমকা খুশি হয়ে ওঠা।
ণ. মনোরোগের বিভিন্ন উপসর্গ, মেযন দৃষ্টিভ্রম ও উদ্ভট চিন্তার গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাওয়া।

(৭) কিশোর অপরাধ কমাতে স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন জব্দ করুন

মানুষ চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারী, খুনি ইত্যাদি হিসেবে জন্মায় না। পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হওয়ার সময় একজন মাছুম অর্থাৎ বেগুনাহগার হিসেবে জন্মায়। জন্মের পর পরিবারের আচরণগুলো তার আচরণে প্রকাশ পায়। এছাড়া সে সমাজে বসাবসা করে তাও তার মধ্যে কাজ করতে থাকে। এছাড়া সবচেয়ে বেশী নিয়ন্ত্রণ করার স্থান হচ্ছে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এখন যে সব শিশু জন্মাচ্ছে। সে জন্মের পর বিছানায় থাকা অবস্থায় মোবাইল ফোনের রিংটোনের আওয়াজ শুনে দুধ পান করছে। এটা এখন আর আশ্চার্য নয়, এটা হলো ৩ সত্যি। বিশ্বাসযোগ্য কথাকো জোর দিয়ে বলা সম্ভব। মাত্র একযোগ পূর্বেও

Dhaka University Institutional Repository

মোবাইল ফোনের ব্যবহার খুব কম ছিলো। এখন ডিজিটাল দেশের এক প্রান্তের সংবাদ থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছানোর লক্ষ্যে এ টেকনোলজির ব্যবহার খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে।প্রয়োজনের তাগিতে আমরা মোবাইল ব্যবহার না করে এখন চলতে পারছি না। খুব নিকটে রয়েছে কোন ব্যক্তি, তার কাছে হেটে গিয়ে বলা যায়। কিন্তু খুব সহজে মোবাইল ফোনে কথা বলেন। অনেকটা অলস প্রকৃতির মত হয়ে গেল মানুষ। প্রশ্ন হলো কোন বয়সের লোক এসব মোবাইল ফোন ব্যবহার করবে। এ ব্যাপারে কোন নির্দেশনার প্রয়োজন নাই কি? নিশ্চয়ই এর ব্যবহারের জন্য বয়সের সময়সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। কারণ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অশ্লিল ভিডিও ধারণ এবং তা সামাজিক ওয়েব সাইটের মাধ্যমে ডাউনলোড করা এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়টি অনেক ব্যবসায়ীরা প্রধান কাজ হিসেবে নিয়েছেন।পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মোবাইল ফোনের মধ্যে আপত্তিকর ভিডিও যারা বেশী উপভোগ করছে তারা অধিকাংশই কিশোর বয়সের ছেলে মেয়ে। মোবাইলের ক্ষতিকর দিকটিকে ব্যবহার মনে করে স্কুল পড়ুয়া ছেলেদের নিকট এখন দৈনন্দিন কাজের অংশ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এসব ভিডিও দেখে তারা ইভটিজিং, অপহরণ ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে খুব সহজে জড়িয়ে পড়ছে। যা সম্প্রতি পত্র-পত্রিকায় অপহরণ, ইভটিজিং ও এ জাতীয় অপরাধমূলক কাজের সংবাদে অপরাধকারীর বয়স নির্ণয় কর দেখা যায়।প্রাপ্ত বয়স্ক না হয়েও একটি কিশোর ছেলে যখন সকল গোপনীয়তা জেনে পেলে, তখন তার আর কোন লজ্জাবোধ থাকে না। সে বড়দের মত স্বাভাবিক হয়ে যায়। তাই বিদ্যালয়ের প্রধান, শ্রেণী শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলে কিশোর অপরাধ কমাতে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রদের মোবাইল জব্দ ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করার মিশন তৈরী করতে হবে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু করতে হবে। আর না হয় এর ভয়াভহতা আরো বৃদ্ধি পাবে।

(৮) ধর্মীয় সংস্কৃতি অনুশীলনঃ

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে ধর্মীয় সংস্কৃতির অনুশীলনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কেননা মানুষের শুধু শারীরিক সত্তা নয়, তার একটি মানস ও মনন রয়েছে। এ মনন বা মানসের বিকাশ দরকার এবং সেটা কেবল বস্তুগত নয়। এ মানস বিকাশ ধর্মের দ্বারা সম্ভব। ধর্ম মানব জীবনকে পরিপূর্ণ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে এবং ধর্ম হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবে মূল্যবোধে ও নৈতিকতার ভিত্তি। এক কথায় মানব জীবনের ভাল মন্দ, ন্যায অন্যায় নৈতিকতা-অনৈতিকতা ইত্যাদি বিচারবিবেচনার এক সাবলীল ও সুষ্ঠু নির্ণায়ক নীতি বা বন্ধন হলো ধর্ম।পৃথিবীর সৃষ্টির শুরু থেকে যুগে যুগে যত ধর্ম এসছে, যত ধর্মগুরু এসেছেন সবাই অন্যায়ের বিপক্ষে ন্যায়ের ও মানবতার জয়গান গেয়েছেন। সততা, সাধুতা, সেবা, সংযম, সৌজন্য, সম্প্রীত, সৌহার্দ্য, সদাচার, দয়া, ক্ষমা, প্রেম, পরোপকার, পরমতসহিষ্ণুতা, বিনয়, বদান্যতা ইত্যাদি সব ধর্মেরই সারকথা। সব ধর্মই তার প্রতিটি অনুসারীকে শৈশব-কৈশোর থেকে পথে চলার, সুন্দভাবে বাঁচার, সরলপথ অনুসরণ করার তাকিদ দিয়েছে। সুতরাং আশৈশব স্বধর্মের বিশুদ্ধ চর্চা ও যথাযথ অনুশীলন ব্যক্তির অপরাধস্পৃহা অবদমনসহ আত্মশুদ্ধির জন্য সহায়ক।কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম সন্তানদের সঠিক প্রতিপালনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে ইসলাম এ প্রসঙ্গে ইসলামের নির্দেশনা হচ্ছে প্রথম সাত বছর তাকে (সন্তানকে) মুক্ত রাখ, দ্বিতীয় সাত বছর তাকে শিষ্টাচার (আদব) শিক্ষা দাও এবং তৃতীয় সাত বছর তার সাথে গভীর সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোল। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) বলেছেন, পিতার ওপর পুত্রের যেরূপ অধিকার আছে পুত্রের ওপরও পিতার তদ্রূপ অধিকার আছে। পিতার অধিকার হলো পুত্র শুধু আল্লাহকে অমান্য করার আদেশ ব্যতীত তাঁর সকল আদেশ মেনে চলবে এবং পুত্রের অধিকার হলো পিতা তার একটি সুন্দর নাম রাখবে, তাকে উত্তম প্রশিক্ষণ দেবে এবং কুরআন শিক্ষা দেবে। (নাহজ আল বালাগা)ইসলাম অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগেই তাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে চায়। এ কারণে ইসলামী শরিয়াত মানুষের নৈতিক সুরক্ষার্থে

নিম্নলিখিত কর্মসূচি, বিধান ও মূলনীতির মাধ্যমে ব্যক্তির চারদিকে সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে দেয়, যার বিশুদ্ধ চর্চা তাকে পাপের দিকে আকর্ষণ ও পদস্খলন থেকে নিয়ত রক্ষা করতে সহায়ক হয় ।

ক. ইসলাম আশৈশব ব্যক্তির সংশোধন, ব্যক্তির মন পবিত্র ও পরিশুদ্ধকরণ এবং তাকে সুন্দর ও নির্মলভাবে লালন ও প্রশিক্ষণ দিয়ে উন্নত মহান চরিত্রে বিভূষিত করে তোলে । তার হৃদয়ে ঈমানের বীজ বপন করে তাকে কল্যাণমুখী বানিয়ে তার মধ্যে অপরাধ ও বিপর্যয় বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করে দিতে চায় । আর প্রকৃত সঠিক ঈমান ও একনিষ্ঠ দৃঢ় প্রত্যয়ই হচ্ছে সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং নির্লজ্জতা ও নিষিদ্ধ কাজ অবলম্বনের বিরুদ্ধে এক শক্ত প্রতিরোধ । কেননা সে নিঃসন্দেহে জানে ও বিশ্বাস করে যে, সে যা কিছুই করছে, আল্লাহপাক সে বিষয়ে পুরাপুরি অবহিত আছেন ।

খ. ইসলাম নিষিদ্ধ কাজ করা থেকে দূরে রাখার জন্য খারাপ পরিণতির ভয প্রদর্শন করে । সে খারাপ পরিণতি মানুষের সম্মুখে ভয়াবহরূপে চিত্রিত করে পেশ করা হয়েছে । যা স্বভাবতই মানব মনে এমন তীব্র ভীতির সঞ্চার করে যে, সে কিছুতেই সেই খারাপ কাজের দিকে পা বাড়াতে সাহস করে না ।

গ. ইসলাম শরীয়তী বিধি বিধানের মাধ্যমে সকল ভালো কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, পারস্পরিক কল্যাণ কামনা, সৎ কাজে আদেশ, অসৎ কাজে নিষেধ, ধৈর্য অবলম্বনের উপদেশ এবং সকল পাপ, সীমালংঘনমূলক কাজ, অন্যায়, জুলম ও বিপর্যয় প্রতিরোধের নির্দেশ দেয় ।

ঘ. ইসলাম যখন কোনো কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, তখন সেই কাজের সুযোগ করে দেয় বা অনিবার্য করে তোলে যেসব পথ, তাও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেয, সেই উপায়, পথ ও পন্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে । যেসব প্রাথমিক অবস্থা ও কর্মকাণ্ড সেসব নিষিদ্ধ কাজকে সহজ করে দেয়য, সেগুলোও সাথে সাথে নিষিদ্ধ হয়ে যায় ।

ঙ. ইসলাম যখন কোনো জিনিস বা কাজ নিষিদ্ধ করে, তখন তদস্থলে একটা বৈধ কাজের পন্থাও বাতলে দেয় । এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ নিষিদ্ধ কাজটি পরিহার করে বৈধ কাজটির দ্বারা তার প্রয়োজন পূরণ করুক ।

চ. মানুষের মন পবিত্রকরণ, আত্মা বিশুদ্ধকরণ এবং তাদেরকে পাপ ও অভিশপ্ত কাজে জড়িত হওয়াকে রক্ষা করার জন্য ইসলামের অবশ্য পালনীয় দুটি ইবাদাত সর্বজন পরিচিত, মৌলিক এবং ব্যাপক প্রভাবশালী ইসলামী জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বের অধিকারী । এ দুটি ইবাদাত হলো সালাত ও সাওম । মূলত এ দুটি ইবাদাতই বিশেষ প্রশিক্ষণ স্বরূপ । যার চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে সকল প্রকার হীনতা-নিচতা থেকে মুক্ত করে কেবল এক আল্লাহ অনুগত বান্দাহ বানানো ।

(৯) কিশোর অপরাধীদের জন্য আইন-আদালত ও বিচার ব্যবস্থাপনাঃ

কিশোর অপরাধ থেকে কোনো দেশ বা সমাজ মুক্ত নয় । এটিকে একটি রোগ বলে বিবেচনা করা হয় । একাদশ পোপ ইতালির রোমে কিশোর অপরাধ সংশোধনের জন্য সেন্ট মাইকেল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । এ থেকে বুঝা যায় যে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতেও সমস্যার অস্তিত্ব ছিলো ।তবে কিশোর অপরাধ সংশোধনের ধারণাটি গত শতকের । সভ্যসমাজ ক্রমশ বুঝতে পারলেন যে, কিশোর অপরাধ যতটা না শাস্তিমূলক, তার চেয়েও বেশি সংশোধনমূলক । বাংলাদেশে এতদসংক্রান্ত আইন তৈরির

Dhaka University Institutional Repository

প্রেক্ষাপট : ১৯৭৪ সালে শিশু-কিশোরদের জন্য চিল্ড্রেন এ্যাক্ট, ১৯৭৪ প্রণয়ন করা হয়। ১৯৭৬ সালে চিল্ড্রেন্স রুলস, ১৯৭৬ জারী করে প্রথমত ঢাকা জেলা এবং পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে সমগ্র বাংলাদেশকে এ আইনের আওতায় আনা হয। শিশু আইন, ১৯৭৪ এবং শিশু বিধি, ১৯৭৬'র ভিত্তিতে ১৯৭৮ সালের ১লা জুন তারিখে ঢাকার অদূরে টঙ্গীতে ২০০ আসন বিশিষ্ট জাতীয় কিশোর অপরাধ সংশোধনী প্রতিষ্ঠান (বর্তমান নাম কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র) স্থাপন করা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো, অপরাধী কিশোরদের কারাগারে অপরাপর বয়স্ক, দাগী অপরাধী ও অন্যান্য খারাপ পরিবেশ থেকে দূরে রেখে শাস্তির পরিবর্তে সংশোধন এবং অপরাধপ্রবণ, উচ্ছৃঙ্খল ও অভিভাবক কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কিশোরদের চরিত্র সংশোধনের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। এ প্রতিষ্ঠানটি কিশোর আদালত, কিশোর হাজত, কিশোর সংশোধনী কেন্দ্র- এ তিন ভাগে বিভক্ত। এরপর ১৯৯৬ সালে কিশোর অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রণের আশা নিয়ে সরকার যশোর শহরের অদূরে পুলেরাহাট নামক স্থানে আরও একটি কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠান চালু করেছেন। তাছাড়া গাজীপুরের কোনাবাড়িতে রয়েছে একটি কিশোরী সংশোধনী কেন্দ্র । এটি স্থাপিত হয় ১৯৮২ সনে ।কিশোর অপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়ার জন্য যে আইন রয়েছে সেটা অবশ্যই মানা উচিত। কিশোররা অপরাধ করলে তাদের বিচার করা উচিত তবে তার আগে কিশোরদের সংশোধনের বিষয়টি গুরুত্ব দতে হবে। এ সমস্ত কিশোরের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা বুঝতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই কিশোর বয়সে সবাই একটু উচ্ছৃঙ্খল থাকে। তবে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে যেন কোনোভাবেই অপরাধের দিকে তাদের এগিয়ে দেয়া না হয়। কিশোর অপরাধীদের কোনোভাবেই দাগি আসামিদের সঙ্গে রাখা উচিত নয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ কিশোর অপরাধ বিচার সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। কিশোর অপরাধীদের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ কিশোর অপরাধ দমনে সংশোধনটা অনেক বেশি দরকার।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

কিশোর অপরাধ সম্পর্কিত আইন

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

কিশোর অপরাধ সম্পর্কিত আইনঃ

১. ভবঘুরে আইন, ১৯৫৩

অভাব অনটন, পারিবারিক ও সামাজিক বঞ্চনা, অবহেলা আর অনাদরে গৃহত্যাগী কিশোর-কিশোরীরা শহরে এসে হয় ভবঘুরে বা টোকাই। ভবঘুরেদের পুনর্বাসনকল্পে ১৯৪৩ সালে কলকাতায় ভবঘুরে আইন জারি হয়। বাংলাদেশে এ আইন প্রবর্তিত হয় ১৯৫৩ সালে। এরপর ১৯৬২ সালে গাজীপুরের পুবাইলে এবং ময়মনসিংহের ধলায় দু'টি ভবঘরে আশ্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭৭ সালে দেশের বিভিন্ন স্থানে আরো ৪টি আশ্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এগুলো হলো–ঢাকার মিরপুর, গাজীপুরের কাশিমপুর, নারায়নগঞ্জের গোদাণনাইল ও মানিকগঞ্জের বেতিলে। এসব আশ্রয় কেন্দ্র আসন খালি হয়ে গেলেই পুলিশের মাধ্যমে ভবঘুরেদের আটক রাখা হয়। প্রথমে তাদেরক মীরপুর ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্রে রাখা হয়। এখানে সামারী কোর্ট বসে। স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পরিচালনা করেন। শুনানির পর আবাস স্থলহীন, পরিচয়হীনদের রেখে দেয়া হয় ভাবঘুরে আশ্রমে। অন্যদের অর্থাৎ যারা নাম ঠিকানা যথাযথভাবে বলতে পারে তাদেরকে ফেরৎ দেয়া হয অভিভাবক অথবা আত্নীয়-স্বজনদের কাছে। আশ্রয় কেন্দ্রে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাশাপাশি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশোনাও করানো হয়। এখানে আশ্রিতদের বেশির ভাগই ১২-২৫ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরী।

২. শিশু আইন ১৯৭৪: অপরাধী কিশোরদের সংশোধনার্থে প্রণীত শিশু আইন, ১৯৭৪ এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ আইনে বলা হয়েছে (ধারা-৬) বয়স্ক অপরাধীদের সাথে কিশোর অপরাধীদের বিচার একত্রে হবে না।

১. ফৌজদারি কার্যবিধির ২৩৯ ধারা অথবা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাই থাকুক না কেন কোনো বয়স্ক অপরাধীর সাথে একত্রে কোনো কিশোর অপরাধীর বিচার করা যাবে না।
২. যদি কোনো শিশু ফৌজদারি কার্যবিধির ২৩৯ ধারায় বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনো আইনে অপরাধী হয় তবে আমল গ্রহণকারী আদালত শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তির বিচার পৃথককভাবে করার নির্দেশ দেবেন।

ধারা-৪৯-জামিনে মুক্তি প্রদান করা না হলে সে ক্ষেত্রে করণীয়-

১. যে ক্ষেত্রে আপাত দৃষ্টিতে ১৬ বছরের কম বয়স্ক শিশুকে ৪৮ ধারা অনুযাযী জামিনে মুক্তি না দেয়া হয় সেক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত শিশুকে আদালতে হাজির করার পূর্ব পর্যন্ত রিমান্ড হোম বা নিরাপদ হেফাজতে রাখবেন।

২. আদালত উক্ত শিশুকে জামিনে মুক্তি না দিলে রিমান্ড হোম বা নিরাপদ হেফাজতে রাখার জন্য আদেশ দেবেন।

সূত্র ১৯৭৪ সালের শিশু আইন অনুযায়ী (২ ধারা)
(2010, Legislative and Parliamentary Affairs Division, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections_all.php?id=470)

Dhaka University Institutional Repository

ধারা-৫- শাস্তি প্রদানে বাধা নিষেধ-

১. অন্য কোনো আইনে যাই থাকুক না কেন, কোনো শিশুকে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা কারাদণ্ড প্রদান করা যবে না। তবে শর্ত থাকে যে, আদলত যদি মনে করেন যে, শিশুটি এতই অপরাধ করছে যে অত্র বিধানে শাস্তি যথেষ্ট নয় অথবা যদি আদালতে সন্তুষ্ট হন যে শিশুটি এত দুরন্ত ও লম্পট চরিত্রের যে তাকে কোনো সংশোধনাগারে রাখা যথোপযুক্ত হলে আদালত শিশুটিকে কারাদণ্ড প্রদান করতে পারেন অথবা আদালত যেরূপ মনে করেন সেরূপ জায়গায় আটক থাকার আদেশ প্রদান করতে পারেন। তবে শর্ত থাকে যে, যে মেয়াদের জন্য তাকে দণ্ডিত করা যেত তার চেয়ে বেশি সময়ের জন্য তাকে আটকাধীন রাখা যাবে না। তবে আরো শর্ত থাকে যে, এরূপ আটকাবস্থার যে কোনো সময় আদলত উপযুক্ত মনে করলে এরূপ আটক রাখার পরিবর্তে ১৮ বৎসর বয়স অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত কোনো সংশোধনাগারে রাখার আদেশ প্রদান করতে পারে।

২. কিশোর অপরাধীকে তার কারাদণ্ড ভোগকালীন সময়ে বয়স্ক কয়েদীদের সাথে একত্রে আটক রাখা যাবে না।

ধারা-৫২ সংশোধনাগারে আটক রাখা-

কোনো শিশু যদি মৃত্যুদণ্ডে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দণ্ডিত হয়, তাহলে আদালত উক্ত শিশুকে সংশোধনাগারে আটক রাখার আদেশ প্রদান করতে পারবেন, তবে এ আটকের মেয়াদ ২ বছরের কম ও ১০ বছরের বেশি হবে না এবং কোনোক্রেমেই শিশুর বয়স ১৮ বৎসর অতিক্রম কত পাবেন।

ধারা-৫৩ কিশোর অপরাধীকে অব্যাহতি প্রদান বা যথোপযুক্ত হেফাজতে রাখা-

১. আদালত উপযুক্ত মনে করলে কোনো শিশু অপরাধীকে ৫২ ধারা অনুযায়ী কিশোর সংশোধনাগারে আটক থাকার আদেশের পরিবর্তে নিম্নে বর্ণিত নির্দেশ প্রদান করতে পারেন

ক. যথাযথ সতর্ক করে অব্যাহতি, অথবা জামানতসহ বা ব্যতীত সর্বোচ্চ ৩ সৎসর সদাচরণের মুচলেকা গ্রহণপূর্বক শিশুটির পিতা-মাতা বা অভিভাবক বা বয়স্ক আত্নীয় বা তাদের কোনো যোগ্যতম ব্যক্তির হেফাজতে দিতে পারেন এবং আদালত আরো নির্দেশ প্রদান করতে পারেন যে, শিশুটি প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে থাকবে।

২. যদি আদালত প্রবেশন অফিসার বা অন্য কোনো মাধ্যমে সংবাদ পান যে, শিশুটি সদাচরণে ব্যর্থ হচ্ছে তখন আদালত তা তদন্ত করে সন্তুষ্ট হলে প্রবেশনের বাকি মেয়াদ কোনো সংশোধনাগারে আটক রাখার নির্দেশ প্রদান করতে পারেন।

ধারা-৬৫ পলাতক শিশুর প্রতি পযুলিরেমকার্যক্রম-

বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাই থাকুক না কেন, কোনো পুলিশ অফিসার বিনা পরোয়ানায় সংশোধনাগার হতে বা কোনো তত্ত্বাবধায়কের নিকট হতে পলাতক কোনো শিশুকে গ্রেফতার করতে পারবেন এবং এরূপ শিশুর বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ রেকর্ড না করে বা তাকে অভিযুক্ত নাকরে উক্ত শিশু বা কিশোর অপরাধীকে সংশোধনাগারে বা তত্ত্বাবধায়কের নিকট পুনরায় প্রেরণ করবেন এবং কোনো শিশু বা কিশোর অপরাধী এরূপ পলাতক হবার কারণে কোনো অপরাধ করেনি বলে ধরে নেয়া হবে।

৩. বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬

ধারা-৩৪ শিশু ও কিশোর নিয়োগে বাধা নিষেধ ।

১. কোনো পেশায় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো শিশুকে নিয়োগ করা যাইবে না বা কাজ করিতে দেয়া যাইবে না ।

২. কোনো পেশায় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো কোনো কিশোরকে নিয়োগ করা যাইবে না বা কাজ করিতে দেয়া যাইবে না । যদি না-

ক) বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে একজন সেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক তাহাকে প্রদত্ত সক্ষমতা প্রত্যয়নপত্র মালিকের হেফাজতে থাকে ।

খ) কাজে নিয়োজিত থাকাকালে তিনি উক্ত প্রত্যয়নপত্রের উল্লেখ সম্বলিত একটি টোকেন বহন করেন ।

ধারা-৩৯ কতিপয় কাজে কিশোর নিয়োগে বাধা-

কোনো প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি চালু অবস্থায় উহা পরিষ্কারের জন্য, উহাতে তেল প্রদানের জন্য বা উহাকে সুবিন্যস্ত করার জন্য বা উক্ত চালু যন্ত্রপাতির ঘূর্ণায়মান অংশগুলির মাঝখানে অথবা স্থির এবং ঘুর্ণায়মান অংশগুলির মাঝখানে কোনো কিশোরকে কাজকরিতে অনুমতি দেয়া যাইবে না ।

ধারা-৪০ বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির কাজে কিশোর নিয়োগ

১. কোনো কিশোর যন্ত্রপাতির কোনো কাজ করিবেন না, যদি না

ক. তাহাকে উক্ত যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত বিপদ সম্পর্কে এবং এই ব্যাপারে সাবধনতা অবলম্বন সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ওয়াকেবহাল করানো হয়এবং

খ. তিনি যন্ত্রপাতিতে কাজ করার জন্য যথেষ্ট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা তিনি যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত অভিজ্ঞ এবং পুরোপুরি জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে কাজ করেন ।

ধারা-৪১ কিশোরের কর্মঘণ্টা

কোনো কিশোরকে কোনো প্রতিষ্ঠানে সন্ধ্যা ৭:০০ ঘটিকা হইতে সকাল ৭:০০ ঘটিকার মধ্যবর্তী সময়ে কোনো কাজ করিতে দেয়া যাইবে না ।

ধারা-৪২-ভূগর্ভে এবং পানির নিচে কিশোরের নিয়োগ নিষেধ । কোনো কিশোরকে ভূগর্ভে বা পানির নিচে কোনো কাজে নিয়াগ করা যাইবে না ।

কিশোর আইনসমূহ পর্যালোচনা-

প্রথমত শিশু আইন, ১৯৭৪ এর ধারাগুলো পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, কিশোর আদালত সাধারণ কোনো শাস্তি প্রদান না করে মূলত কিশোরদেরকে সংশোধনের ব্যবস্থা করেন । কিন্তু আমাদের দেশের কিশোর সংশোধনাগারের সংখ্যা হাতে গোণা কয়েকটি মাত্র । যা প্রয়োজনের তুলনায় নেহায়েত অপ্রতুল । অন্যদিকে দেশের কারাগারগুলোর বাস্তব অবস্থা উল্টো । সেখানে শিশু-কিশোর অপরাধীদেরকে সাধারণ কয়েদীদের সাথে রাখা হয । যার পরিণতি হয়ে ওউঠে ভয়াবহ । হাইকোর্ট ২০০৩ সালে ৯ এপ্রিল এক আদেশে কিশোর অপরাধীদেরকে সাধারণ কয়েদগীদের সাথে না রাখাসহ পৃথক হোমের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দেন । কিন্তু এ নির্দেশনাটি কার্যকর হয়নি । ফলেযেসব কিশোর অপরাধী কারাগারে থাকছে তারা সংশোধনের সুযোগ তো পাচ্ছেই না বরং বয়স্ক অপরাধীদের সংস্পর্শে এসে আরও দাগী অপরাধীতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে আমাদের দেশের কল-কারখানা মিল-

ফ্যাক্টরিগুলোতে বাছ-বিচারহীনভাবে নিয়োগ করা হচ্ছে কিশোর-কিশোরীদের। এসব কিশোর-কিশোরী কাজ করার জন্য শারীরিকভাবে সক্ষম কী না সে বিষয়ে কোনো চিকিৎসকের নিকট থেকে সনদপত্র গ্রহণের গরজ বোধ করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরীদের এমন সব ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা হয় যা শ্রম আইনের সরাসরি লঙ্ঘন। শুধু তাই না, তাদেরকে দিয়ে গভীর রাত পর্যন্তও কাজ করানো হয়ে থাকে। আমাদের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, অনেক কিশোরী রাত ১০টা পর্যন্ত কাজ করে বিধ্বস্ত দেহ ও মন নিয়ে ঘরে ফিরছেন।

সূত্রঃ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬
(http://www.boi.gov.bd/index.php/component/businesslaws/?view=lawdetails&law_id=24)

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র

৪.১ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র: কিশোর অপরাধ সংশোধনমূলক একটি প্রতিষ্ঠান
৪.২ জাতীয় কিশোর অপরাধ সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের নানা সমস্যা

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র

৪.১ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র ঃ কিশোর অপরাধ সংশোধনমূলক একটি প্রতিষ্ঠান

কিশোর অপরাধ সংশোধন বা উন্নয়ন কেন্দ্র যা হতে পারে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনের অংশীদার। "শাস্তি নয় সংশোধন, অপরাধ হবে অপসারন" এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে পেশাদার সমাজকর্মী ও অভিজ্ঞ সাইকোলজিষ্ট এর মাধ্যমে শিশুর মানসিকতা পরিবর্তন এবং সুস্থ্য স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন গড়ার উদ্দেশ্যে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র পরিচালিত হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে বৃহত্তর ঢাকা জেলার রূপগঞ্জ থানার মুড়াপড়া জমিদার বাড়িতে "বোষ্টাল স্কুল" নামে অবাধ্য কিশোরদেরকে সুস্থ্য স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার প্রত্যয়ে একটি আবাসিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭৮ সালে টঙ্গীতে বোষ্টাল স্কুলের আদলে ২০০ আসন বিশিষ্ট দেশের একমাত্র "জাতীয় কিশোর অপরাধী সংশোধন প্রতিষ্ঠান" তৈরী হয়। মূলতঃ শিশু আইন, ১৯৭৪ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়। শিশু কিশোরদের সংশোধন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হয় এখানে। ২০০৩ সালে তৎকালীন সরকার এই প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করে "কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র" নামে নামকরন করে। সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে।

এক নজরে তথ্য সমূহ ঃ

বাংলাদেশে সরকারীভাবে ০৩টি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র চালু রয়েছে। কেন্দ্র সমূহের অবস্থানঃ-

১। ২০০ আসন বিশিষ্ট কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, টঙ্গী, গাজীপুর,

২। ১৫০ আসন বিশিষ্ট কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, পুলের হাট, যশোর এবং

৩। কিশোরীদের জন্য ১৫০ আসন বিশিষ্ট কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র, কোনাবাড়ী, গাজীপুর।প্রতিটি কেন্দ্রে আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু, কিশোর, কিশোরীদের কাউন্সিলিং, মটিভেশন ও গাইডেন্সের মাধ্যমে তাহাদের মানসিকতার পরিবর্তন, শিক্ষা প্রদান, কারিগরি প্রশিক্ষনের আওতায় সুস্থ্য সুন্দর স্বাভাবিক জীবন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। কেন্দ্র সমূহ শিশু আইন, ১৯৭৪ এবং শিশু বিধি, ১৯৭৬ এর আলোকে শিশু কিশোর/কিশোরীদের উন্নয়নে কাজ করছে।

মূলত ০৩টি কারনে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে কিশোরদের আগমন ঘটে।

১) শিশু আইন, ১৯৭৪ এর ৩২ ধারা অনুযায়ী দুঃস্থ, অবহেলিত, অভিভাবকহীন ও নির্যাতিত শিশু/কিশোরদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বিজ্ঞ আদালতের আদেশ অনুযায়ী।

২) শিশু আইন, ১৯৭৪ এর ৩৩ ধারা অনুযায়ী অনিয়ন্ত্রিত বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত শিশু/কিশোরকে পিতা-মাতা বা বৈধ অভিভাবক কর্তৃক কিশোর আদালতে মামলা করা ও বিজ্ঞ আদালতের আদেশের মাধ্যমে।

৩) শিশু আইন, ১৯৭৪ এর ৫৫ ও ৫৬ ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন আইনে পুলিশ কর্তৃক আটক হয়ে বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে বা মেয়াদপ্রাপ্ত(সাজা) হলে।

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রম প্রধানত ০৩টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়।

১. কিশোর আদালত,

২. কিশোর হাজত বা রিমান্ড হোম ও

৩. সংশোধনী কার্যক্রম।

অভিভাবক কর্তৃক অনিয়ন্ত্রিত বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত শিশু/কিশোরকে কিশোর আদালতে মামলার মাধ্যমে এই কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ০৩ বৎসর সংশোধনের জন্য রাখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ১টি কার্টিজ পেপার, ৫ টাকার কোর্ট ফি, অবাধ্য সন্তানের ৪ কপি ও অভিভাবকের ১ কপি সত্যায়িত ছবি এবং উক্ত সন্তানের চরিত্র সম্পর্কে চেয়ারম্যান/কমিশনারের প্রত্যায়নপত্র জমা দিতে হবে।

আবাসন ব্যবস্থাঃ

শিশু/কিশোরদের বয়স, আচার আচরন, মামলার ধরন বিবেচনা করে সোস্যাল কেইস ওয়ার্কারদের পরামর্শ মতে আলাদা আলাদা আসন বরাদ্দ হয়ে থাকে। বিছানাসহ শয়নকক্ষ, পর্যাপ্ত ইলেকট্রিক ফ্যান, নামাজ কক্ষ, চিত্তবিনোদন কক্ষ, ইনডোর ও আউটডোর গেম, পর্যাপ্ত প্রক্ষালন ও গোসলখানা সুবিধা রয়েছে কেন্দ্র সমূহে। প্রতিটি কেন্দ্রে তত্বাবধায়ক, সহকারী তত্বাবধায়ক, সোস্যাল কেইস ওয়ার্কার, সাইকিয়াট্রিক সোস্যাল ওয়ার্কার, হাউজ প্যারেন্টসহ আনুসঙ্গিক কর্মচারীদের নিরলস কার্যক্রম রয়েছে এখানে।

সংশোধনী কার্যক্রম সমূহঃ

সোস্যাল কেইস ওয়ার্কার, সাইকিয়াট্রিক সোস্যাল ওয়ার্কার, প্রবেশন অফিসারগন প্রত্যেক শিশু/কিশোরদের ব্যক্তিগত নথি সংরক্ষণ করেন। ব্যক্তি সমাজকর্ম ও দলীয় সমাজকর্ম পদ্ধতীর মাধ্যমে "র‍্যাপট বিল্ডিং" করে কিশোরদের সম্পর্ক উন্নয়ন করার পাশাপাশি তাদের শারীরিক ও মানষিক বিষয়সমূহ বিবেচনা করতঃ অভিভাবকদের সহিত কাউন্সিলিং করে সমস্যা চিহ্নিত করা হয়। চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে তাদের স্বভাব এবং চরিত্রের পরিবর্তন করা হয়। প্রয়োজনীয় ট্রিটমেন্ট প্লান ও রিহেবিলেটেশন প্লান করে সেই অনুযায়ী শিশু/কিশোরদের চলার পরামর্শসহ নিবিড় ফলোআপ করা হয়। নিয়মিতভাবে কাউন্সিলিং ও মটিভেশন করা হয় এই কেন্দ্র সমূহে। সংশোধনী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সাধারন শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, শরীর চর্চা, খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন, ধর্মীয় কার্যক্রম, বাগান পরিচর্যা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, ক্রীড়া প্রতিযোগীতা, জাতীয় দিবস উদযাপনসহ অভিভাবকদের সহিত প্রতি মাসের ৭ ও ২২ তারিখে সাক্ষাৎকার প্রদান নিশ্চিত করা হয়। কারিগরি শিক্ষার জন্য ০৪টি ট্রেড যথা ১. অটোমোবাইল, ২. কাঠ শিল্প, ৩. বিদ্যুৎ ও হাউজ ওয়ারিং ও ৪. সেলাই শিক্ষা প্রদান করা হয়। বর্তমানে কম্পিউটার প্রশিক্ষন পদ্বতীও যুক্ত হয়েছে এসব কেন্দ্রে। সাধারন শিক্ষার আওতায় ৫ম শ্রেনী পর্যন্ত শিক্ষা প্রদান করা এখানে। ইহাছাড়া এখানে সকল শিশু কিশোরদেরকে সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করতে হয়। যেমন- প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে পিটি-প্যারেড অতঃপর নাস্তা, নাস্তার পর এ্যাসেম্বলী শেষে স্কুল/ট্রেড শিক্ষা। দুপুরে ০২ ঘন্টা বিশ্রামের পর আউটডোর খেলাধুলা, সন্ধায় হাউজে প্রবেশ, এশার নামাজ পর খাওয়া শেষে লেখাপড়া, অতঃপর টিভি প্রোগ্রাম দেখার পাশাপাশি ইনডোর গেম, রাত ১১.৩০ ঘটিকায় বাধ্যতামূলক ঘূম।

কিশোর অপরাধ সংশোধনী প্রতিষ্ঠান সম্পরকে তথ্যাবলি

ঢাকার অদূরে টঙ্গীতে অবস্থিত কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের সংগৃহিত বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্তের আলোকে একটি প্রতিবেদন দেয়া হল-

এক নজরে তথ্য সমূহ ঃ

১. প্রতিষ্ঠানের নামঃ জাতীয় সংশোধনী সেবা প্রতিষ্ঠান

২. প্রশাসনিক বিভাগঃ সমাজ সেবা বিভাগ

৩. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ সমাজল্যাণ মন্ত্রণালয়

৪. প্রতিষ্ঠাকালঃ শিশু আইন ১৯৭৪ এবং ১৯৭৬ সালের শিশু বিধিমালা অনুযায়ী পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৮ সালের জুন মাসের প্রতিষ্ঠিত হয় ।
৫. পূর্বনামঃ পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল "জাতীয় কিশোর অপরাধকেন্দ্র" পরবর্তীতে এই নাম পরিবর্তন করে "জাতীয় কিশোর সংশোধন প্রতিষ্ঠান" রাখা হয় ।
৬. জমির মোট পরিমাণ ঃ ৩.৭৮ একর ।
৭. পরিচালনাঃ এটি সমাজ সেবা অধিদপ্তর দ্বারা পরিচালিত । ১৯৭৪ সালের শিশু আইন ও ১৯৭৬ সালের শিশু বিধি অনুযায়ী এ কেন্দ্র পরিচালিত ।
৮. ভবন সংখ্যাঃ ০৮টি ।
বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা (২০১২ পর্যন্ত)
অনুমোদিত নিবাসীর সংখ্যা = ২০০ জন

জাতীয় কিশোর অপরাধ সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখা কিশোর অপরাধ সংশোধনী প্রতিষ্ঠান ৩টি শাখায় বিভক্ত ।

১. কিশোর আদালত
২. কিশোর হাজত
৩. কিশোর সংশোধন কেন্দ্র

১. কিশোর আদালত ঃ

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে শিশুদের স্বার্থে এবং কল্যাণে এ আদালতের উৎপত্তি হয় । শিশুদের যাবতীয় অন্যায়, অবিচার এবং বিভিন্ন ধরনের বিচারের ব্যবস্থা করা হয় । ১ জন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এর তত্ত্বাবধানে এর বিচার কার্য সম্পন্ন হয় । বিচারের সময় আনুষাঙ্গিক ব্যাপারগুলো আদালতে আলাদাভাবে সংশোধন করা হয় । অপরাধীর অপরাধের কারণ অনুসন্ধান করে তার সংশোধন ও পূর্নবাসনের ব্যবস্থা করাই কিশোর আদালতের উদ্দেশ্য ।

২. কিশোর হাজত ঃ

৫ জন শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণে যে পর্যবেক্ষণ রয়েছে তাকেই কিশোর হাজত বলে । বিচারকের কাছে এখানে কিশোর অপরাধীর কোন বিচার থাকলে তা কেস হিস্ট্রি করে অর্থাৎ নোট করে জমা দেয়া হয় । পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট আসার পর নির্দিষ্ট সময় দেয়া হয় । তিন ধরনের কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের জন্য আনা হয় ।
যেমনঃ
ক.পুলিশ বাদী
খ.পরিবার কর্তৃক
গ.দুঃস্থ ভাসমান শিশু
বাংলাদেশের আইন মোতাবেক ৭ বছরের নীচে একজন শিশু যে কোন ধরনের অপরাধ করলেও তাকে অপরাধী বলে গন্য করা হবে না । আদলত ৭-১২ বছরের শিশুর অপরাধের আমল দিবে । আদালতে ১২-১৬ বছরের শিশুকে বিচার এর প্রেরণ করা হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

ক. পুলিশবাদী

কোন শিশু কিশোর যদি অপরাধ করে এবং পুলিশের হাতে ধরা পড়ে থানায় নিয়ে আসে, তাকে বলে ডেয়ার কেস। অন্যায়ের ভিন্নতা অনুযায়ী এখানে জজ ছাড়াই দুই পর্যায়ে বিচার হয়ে থাকে। ত্রিশ বছর হলে তাকে যাবজ্জীবন বলে।

খ. পরিবার কর্তৃক

অভিভাবকদের কথা না শুনে কোন কথা না শুনে কোন কিশোর যদি শিশু আইনের ৩৩ নং ধারায় কোন অপরাধ করে তাকে সংশোধনের জন্য এখানে পাঠানো হয়। এদেরকে সংশোধনের জন্য ৬মাস, থেকে ৩ বছর পর্যন্ত এখানে রাখা হয়। মেমনঃ মস্তান, চাঁদাবাজ, ছিনতাইকারী ইত্যাদি।

গ. দুঃস্থ ভাসমান শিশু

শিশু আইনের ৩২ নং ধারা অনুযায়ী রাস্তা ঘাটে, লঞ্চে, সিনেমা হলে, ফুটপাতে, প্লাটফর্মে পিতামাতা বা অভিভাবক থেকে বিচ্ছিন্ন শিশুদদর (যারা ঘুরে বেড়ায়) ধরে এনে এ কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে অনেক পেশাদারী কর্মকান্ড হিসাবে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়।

যাদের যাবজ্জীবন অর্থাৎ ৩০ বছরের কারাদন্ড হয়েছে তাদের একেন্দ্রে রাখা হয় না। ১৮ বছর পর্যন্ত এদেরকে এখানে এগিয়ে গেলে সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করা হয়। এমতা ছেড়ে দিতে অঙ্গীকার বদ্ধ হন।

৩. কিশোর সংশোধন ঃ

৫ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কেস ওয়ার্কারের মাধ্যমে শিশুকে সুনির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত করাকেই সংশোধনী বলা হয়। সমাজ কল্যাণ এর কিছু নিয়ম কানুন জেনে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

কিশোর অপরাধীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে জানার অভিপ্রায়ে কেস দায়ের করার পর একটি পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট পেশ করা হয়। একেন্দ্রে শিশুর একটি কেস হিস্ট্রি তৈরি করে তা ফাইল বন্দী করে রাখা হয়। সে চলে যাওয়ার পর ও তা বহাল থাকে। এখানে শিশুদের উন্নয়ন মূল্যায়ন করার জন্য প্রতি মাসস ২ বার সাক্ষাৎকার নেযা হয়। মূল্যঅয়ণ যাতে নিরপেক্ষ হয়, সেজন্য কেস ওয়ার্কারের সাথে ৭ জন লোক থাকে বিচার ও তত্ত্বাবধানের জন্য। এই মূল্যায়ণের ভিত্তিতে যদি বুঝা যায় তার উন্নতি হচ্ছে অর্থাৎ সে ভাল দিকে যাচ্ছে তখন তার সংশোধন হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। আর উন্নতি না হয়ে অবনতি হলে তাদের প্রতি অনুরূপ ব্যবস্থা নেয়া হয়।

প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার ২০/৩০টি শিশুকে নিয়ে কেসওয়ার্কার মিটিং এ বসেন। এখানে অবস্থিত শিশুদেরকে তিনি গল্প বলেন। বিভিন্ন মনিষীদদর কথা বলেন। বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বোঝান, তাদের ছোট খাট দ্বন্দ্ব থাকলে ভুল বুঝাবুঝি থাকলে তা মিটমাট করেন। এছাড়া কেন্দ্রের অন্যান্য সদস্যগণ শিশুদের ১৬টি ভাগে ভাগ করেন। যেখানে ১ জনের গ্রপে ৮টি শিশু থাকে। পূর্বে এ সংস্থাকে কিশোর অপরাধ কেন্দ্র বলা হলেও উহার নীতি পালনের জন্য একে বর্তমানে কিশোর সংশোধন কেন্দ্র বলা হয়।

২৫ জন গার্ডের পাহারায় প্রতি বৃহস্পতিবার ২.৩০ মিঃ শিশুদের সাথে মত বিনিময় করা হয়। শিশুদের আচরণকে মূল্যায়ণ করার জন্য এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

শিশু অধিকার আইন (১৯৭৪)

বাংলাদেশের শিশু আইন ১৯৭৪ জেনেভা ডিক্লারেশন ১৯২৪ এর উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। এতে অপরাধের সঙ্গে জড়িত শিশুর প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ মানবিক আচরণ করে তার অপরাধমূলক মনোবৃত্তি সংশোধন করে তাকে সমাজে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সুযোগ সস্টির কথা বলা হয়েছে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

- কোন শিশুকে মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা কারাদন্ড প্রদান করা যাবে না।
- শিশু বা কিশোর অপরাধী সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণকালে তাদের দোষী সাব্যস্ত এবং দন্ডিত বলা যাবে না।
- শিশুকে কোন প্রাপ্ত বয়স্কের সঙ্গে যৌথভাবে কোন অপরাধের দায়ে বিচার করা যাবে না। এ ধরনের যৌথ অপরাধ আদালতে বিচারের জন্য গৃহীত হলে আদালত শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কের বিচার পৃথকভাবে করার নির্দেশ দেবেন।
- শুধুমাত্র দায়রা আদলতে বিচার্য মামলা ছাড়া অন্যান্য মামলার (যেতে শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক একত্রে অভিযুক্ত)। শিশু সম্পর্কিত অংশ প্রাপ্তবয়স্ক সম্পর্কিত অংশ থেকে পৃথক করে শিশু সম্পর্কিত অংশ সংশ্লিষ্ট কিশোর আদালতে অথবা যথাক্ষেত্রে ওই আইনের ৪ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রাপ্ত আদালতে বদলি করতে হবে।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে শিশু অধিকারঃ

কোন শিশুর জন্য অত্যাচার, নিষ্ঠুর ও অমানবিক বা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি কাম্য হতে পারে না। ১৮ বছরের কম বয়স্ক কোন অপরাধীকে মৃত্যুদন্ড অথবা মুক্তির সম্ভাবনাহীন যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা যাবে না। বেআইনি অথবা স্বেচ্ছাচারিতামূলকভাবে কোন শিশুকেই তার মুক্ত জীবন থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। শিশুর গ্রেফতার, আটকাদেশ বা কারাদন্ড আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে এবং সেসব পদক্ষেপ শুধুমাত্র সর্বশেষ উপায় হিসেবে ও সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত উপযুক্ত সময়ের জন্য গৃহীত হবে।প্রতিটি শিশুর সঙ্গে বয়সের ভিত্তিতে মানবিক ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতে হবে। শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী না হলে তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক থেকে আলাদা রাখতে হবে। মুক্তজীবন বঞ্চিত প্রতিটি শিশুর জন্য দ্রুত আইনগত ও অন্যান্য উপযুক্ত সহায়তা লাভের সুযোগ দিতে হবে।

৪.২ জাতীয় কিশোর অপরাধ সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের নানা সমস্যা ঃ

প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ ২৪ বছরেও একমাত্র জাতীয়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান "জাতীয় কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠান" আধুনিক ও সময়োপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। ফলে কিশোর অপরাধী নিবাসীরা সংশোধনী কার্যক্রমের অধীনেএসসও উন্নত ও পর্যাপ্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে চাহিদা অনুসারে পুষ্টিসম্পন্ন খাদ্য পাচ্ছে না তারা। বাড়ন্ত কিশোরদের সরবরাহকৃত খাবারে দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন হচ্ছে না। নিবাসিরা ভাতের অভাব অনুভব করে অতৃপ্ত অবস্থায়ই সংশোধনী কার্যকাল অতিক্রম করে। এখানে বর্তমানে অপরাধী নিবাসীকে মাথাপিছু ৫ টাকা ৪৯ পয়সা মূল্যের খাবার প্রতিবেলায় দেয়া হয়। বর্তমান বাজার দরে এই অর্থ অতি নগন্য। এখানে বর্তমান ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখার সুযোগ রয়েছে। কারিগরি প্রশিক্ষণ বলতে দর্জি, কাঠ বৈদ্যুতিক মিস্ত্রির কাজ এবং অটোমোবাইল

ব্যবস্থা থাকলেও তা বর্তমান সময়ের জন্য একেবারে নগন্য। এখানে কোন সার্বক্ষনিক ডাক্তারের ব্যবস্থা নেই। এই প্রতিষ্ঠানির নানা সমস্যার মধ্যে অন্যতম সমস্যা হচ্ছে আইনের জটিলতা। সাধারণ অপরাধীদের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানের সংশোধনী কার্যক্রম অতি সহজ হলেও অবস্থানকারী হত্যা মামলার কিশোর আসামীদের ক্ষেত্রে আইনের মারাত্নক জটিল অবস্থা এখনও বিদ্যমান। বাংলাদেশ শিশু আইনের ৫১ ধারা অনুযায়ী হত্যা মামলার আসামী কিশোরকে আঠারো বছর বয়স, পর্যন্ত সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে রাখার বিধান রয়েছে। এরপর বয়স উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধঅন্ত দেওয়া হয়নি। সুতরাং এই সমস্যা নিয়ে প্রতিষ্ঠান যেমন সমস্যার সম্মুখীন হয় তেমন অপরাধীরা ও সমস্যার ও জীবন নিয়ে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সাহিত্য পর্যালোচনা ও সংবাদপত্রে কিশোর অপরাধ প্রসঙ্গ

৫.১. গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা
৫.২. বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত কিশোর অপরাধ চিত্র

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়
সাহিত্য পর্যালোচনা ও সংবাদপত্রে কিশোর অপরাধ প্রসঙ্গ

৫.১ গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনাঃ

গবেষণা হল প্রচলিত জ্ঞানের সাথে নতুন জ্ঞানের সংযোজন মাত্র। প্রচলিত জ্ঞান অর্থাৎ মানুষ যে জ্ঞান আহরণ করে তা ধারণ করে বিভিন্ন লিটারে বা ডকুমেন্ট আকারে। আর গবেষক হিসেবে এই প্রচলিত জ্ঞঅন সম্পর্কে ধারনা লাভ করা হয় সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে একজন নবীন গবেষক হিসেবে আলোচ্য গবেষনাটি পরিচালনা করতে গিয়ে বিষয়টি সর্ম্পকে প্রচলিত জ্ঞান কোন স্তরে আছে তা বিস্তারিত জানার জন্য গবেষণার প্রাসঙ্গিক বই পত্র, গবেষণা প্রতিবেদন, সাময়িকী, প্রবন্ধ ইত্যাদি পড়াশোনা করতে হয়েছে। কিশোর অপরাধের উপর বেশ কয়েকটি গবেষণা হলেও এর কারনের উপর কোন গবেষণা হয়নি। চেষ্টা ও সামর্থের মাধ্যমে যে কয়টি গবেষণা ও সংশ্লিষ্ট গবেষকের লেখা সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সাহিত্য পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো।

আধুনিক সমাজজীবেন ব্যাপ্তিশীল সমস্যাগুলোর মধ্যে কিশোর অপরাধ অন্যতম। অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও এটি প্রধানত একটি শহর কেন্দ্রীক সমস্যা। আজ কিশোর সম্প্রদায়ের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা শুধু মিথ্যা বলা, স্কুল পালানো ইত্যাদিতেই সীমাবদ্ধ নয়। বহু নতুন ধরনের কর্ম ও শাখা প্রশঅখঅ বিস্তার করেছে। পরিবার ও কিশেঅর অপরাধ শীর্ষক গবেষণাটি তাহমিনা আখতার ও মুহাম্মদ উমর ফারুক কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় ২০০৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য গবেষণাটিতে সরকারি ও বেসরাকরি প্রতিষ টানে অবস্থানরত কিশোরী অপরাধীদের সংখ্যাত্বিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে এবং আবন্ধ ও উন্মুক্ত ধরনের সাক্ষাৎকার অনুসূচীতে সন্নিবেশিত করে খোলামেলা আলোচনায় বন্ধুত্বপূণ সর্ম্পক স্থাপনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংশোধনমূলক ও পূর্ণবাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত কিশোরী অপরাধীদের জনমিতিক ও পারিবারিক অভিভাকদের সামাজিক মর্যাদা অবস্থান যোগাযোগ অপরাধরে প্রকৃতি কারণ অনুভূতি বন্ধুত্ব লেখাপড়া এবং বিনোদন সর্ম্পকে তথ্য সংগ্রহ করাই ছিল এ গবেষনার মূল লক্ষ্য। এখানে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যক কিশোর কিশোরীদের মধ্য থেকে সরল দৈব চারিত নমুনায়ন পদ্ধতিতে ১২০ জন কিশোর অপরাধী নির্বাচন করে তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

এই গবেষণাটিতে কিশোর অপরাধীদের জীবনযাত্রার ধরণ, সংশোধনমূলক প্রক্রিয়া ও সুপারিশসমূহ তুলে ধরা হয়নি। তাছাড়া কোন ধরনের পদ্ধতি বেছে নেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়নি। কোন ধরনের কেস ষ্টাডি করা হয়নি। কোন ধরনের সূচী উল্লেখ করা হয়নি। সুপারিশ ও সীমাবদ্ধতাও আলাদা করে তুলে ধরা হয়নি। যা করা হলে গবেষনাটি অধিক গ্রহণযোগ্য ও প্রতিনিধিত্বশীল হতো। তবে এটা আশা করা যায় যে, সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও গবেষণা প্রবন্ধটি নীতি প্রণেতা, গবেষক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবগ্য যার কিশোর অপরাধ নিয়ে কাজ করছে। তাদের দিক নির্দেশান প্রদানে সক্ষম হবে (আখতার ও ফারুক, ২০০৭)।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক বন্দী নারী ও মেয়ে শিশুদের অবস্থার বিশ্লেষণ আটক নারী বন্দীদের সাধারণ দয়া সমূহ, কারাগারে নারী বন্দীদের আর্থ সামাজিক পটভূমি, আটক বন্দী নারীদের অবস্থা ও অপরাধের প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়গুলো বি,এন, ডাব্লিউ,এল (BNWLA)- এর গবেষনায় বিপদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। তাদের গবেষণার নিরবিচ্ছিন্ন জরীপ ও প্রাথমিক উৎস থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উপাত্ত ও তথ্য সংগৃহিত হয়েছে। তার ১৯৯৪ সালে নির্ধারিত ১০০ জন বন্দীদের মধ্যে ৬৭ জন মহিলা ও ৩৩ জন পুরুষ বন্দীদেরকে দৈবচারিত ভাবে নির্বাচন করে ঢাকা কেন্দীয় কারাগার থেকে। তাদের উপর পূর্ব পরীক্ষিত প্রশ্নমালা ব্যবহার করে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তারা এসব আটক নারী বন্দীদের অপরাধ, আইন প্রয়োগ অস্তিত্বের ধারনা ও পরিচালনার দিক সমূহ এবং পেশাগত চিকিৎসা ও বিনোদন মূলক অবস্থা সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহ করেন। এই গবেষণার অন্যদিকে কারাগারে আটকদের প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর যোগন, বিনোদনমূলক ব্যবস্থঅ ও কারাগারের বন্দীদের উপর ন্যস্ত কাজ, চিকিৎসা প্রদান ব্যবস্থাদি, কারাগারের অভ্যন্তরে শিশুরাআটককৃত নারী বন্দীদের আইনী অধিকার ও আইনী সাহায্যএই সমস্ত বন্দীদের উপর নির্যাতন ও শাস্তি প্রয়োগ ও আইনী সাহায্য এই সমস্ত বন্দীদের উপর নির্যাতন এবং শাস্তি প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য ও উপাত্তের মাধ্যমে বিশদ বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

মূল্যায়ন, উপরোক্ত গবেষণায় যে উপাত্ত সংগৃহিত হয়েছে সেগুলো ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সালের কারাগারে আটককৃত নারী বন্দীদের উপর বিভিন্ন পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করার নিমিত্তে এ গবেষণাটি পরিচালিত হয। কিন্তু উপাত্ত সংগৃহিত হয়েছে ব্যাপক পরিসারে। এগুলো সংগৃহীত হয় ২১ শে নভেম্বর ১৯৯৪ সালে কিন্তু প্রকাশিত হয় কোন সালে তা উল্লেখ হয়নি। বন্দীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রকৃতি সর্ম্পকে কোন তথ্য তুলে ধরা হয়নি। এছাড়াও কোন ধরনের গ্রাহ্য বা চিত্রসূচী উল্লেখ করা হয়নি। গবেষণা পরিচালনার বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এর মধ্যে বহু বিষয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আটক মহিলা বন্দীদের কারাগারের সঠিক চিত্র, দেশ জাতি, নিজ জেলা, বয়স শিক্ষা, বৈবাহিক অবস্থা অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশের কারগারে আটক নারী বন্দীদের নিয়ে পরিচালিত একটি পথ নির্দেশক ও তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণা (ফাউজিয়া করিম ও প্রমুখ, ২০০৪)।

২০০১ সালে সেফ দ্য চিলড্রেন ইউ কে এর সহায়তায় বেসরকারী NGO সংস্থা অধিকার কর্তৃক বাংলাদেশে কিশোর অপরাধীর বিচার ব্যবস্থা ও শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা সংক্রান্ত বর্ষপুঞ্জি তৈরীকরার লক্ষ্যে দেশের কারাগারে ও সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত শিশুদের উপর গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণাটিতে একটি মিশ্র কৌশলের সাহায্যে গুণগত ও পরিমানগত তথ্য সংগ্রহের চেষ্ট করা হয়েছে। কারাগারে আটক শিশু কিশোর অপরাধীদের বিচার ব্যবস্থা সর্ম্পকে তথ্য সংগ্রহ করাই ছিল গবেষণাটির উদ্দেশ্য। সুবিধাজনক নমুনা কৌশলের মাধ্রমে ঢাকা শহরের বিভিন্ন কারাগার ও সংশোধনী প্রতিষ্ঠান যেমন্ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, টংগী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে ১৮ জন শিশু কিশোর অপরাধীকে উত্তরদাতা হিসেবে নির্বাচিত করা হয় এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মাঠ পর্যায় থেকে সংশোধনী প্রতিষ্ঠান যেমন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, টঙ্গী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে ১৮ জন শিশু কিশোর অপরাধীকে উত্তরদাতা হিসেবে নির্বাচিত করা হয এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যে থেকে দেখা যায় যে, ১৮ জন শিশু কিশোরদের বয়স ৯-১৮ বছর পর্যন্ত বয়সের

মধ্যে এবং অধিকাংশ শিশু কিশোরই শ্রমিক, কেউ দিনমজুর কেউ বা গৃহকর্মে নিয়োজিত ছিল। এ শিশুদের পরিণতির জন্য দারিদ্র্যতা কিছুটা দায়ী, আর দায়ী পরিবার ও পরিবেশ। গবেষণায় জানা যায় বির্পযস্ত পরিবারিক বা সামাজিক পরিবেশে শিশুরা সহজেই বিরোধপূর্ণ অবস্থানে আসতে বাধ্য হয়। শিশুদের অপরাধে জড়িয়ে পড়ার পেছনে প্রতিষ্ঠানিক প্রভাব আছে বলে গবেষণায় ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

গবেষণায় আরো জানা যায় আমাদের বিচার ব্যবস্থা এতটাই ধীর গতিতে চলে যে, এ ব্যবস্থার মধ্যে ন্যায় বিচার লাভের চেষ্টা করলে এর ভেতরের জটিলতা শিশুর জন্য আরো নতুন নতুন বিরোধ তৈরী করবে। পুলিশের হেফাজতে থাক অবস্থায় শিশুদের উপর নির্যাতনই সবচেয়ে বেশি উদ্বেগজনক। সাধারণত শিশুরা খুব একটা শারীরিক নির্যাতন থেকে রেহাই পায় না, আর যখন বন্দি অবস্থায় থাকে তখন তারা মারাত্মক শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। এ বিষয়টিও গবেষণায় উল্লেখ্যযোগ্য হারে দেখা গেছে। নগরের অপরাধ অনেক ক্ষেত্রেই শিশুদের প্রতি পুলিশকে বিরাগ ভাজন করে তোলে। তাই সুযোগ পেলে শিশুদের গ্রেফতা রকরতে পুলিশের একটুও দ্বিধাবোধ করে না। গবেষণায় দেখা যায় শিশুদের অধিকাংশকেই বিশেষ আইনে যেমন বিশেষ ক্ষতা আইন, অস্ত্র আইন, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, জন নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ শিশু অধিকার ও দেশের শিশু বিষযক আইনের খুব কমই জানে আর যেটুকুও বা তার জানে তার প্রয়োগ করতেও তারা উৎসাহিত নয়। ফলে পুলিশ অনেক সময় ইচ্ছা করে বা ভুল করে শিশুদের এমন মামলায় গ্রেফতার দেখায় যা কিশোর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত নয়।

কিশোর বিচার ব্যবস্থা শিশুদের প্রতি কিভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে তা বোঝার জন্য দীর্ঘ সময় তাদের আটক রাখা এবং বিচার পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ। বিচারের সময় সাধারণত খুবই লম্বা এবং গ্রেফতার থেকে রায় পর্যন্ত পাঁচ বছরের ও বেশি সময় লাগে। সবক্ষেত্রেই দেখা গেছে বিচার ব্যবস্থা কোন ভাবেই শিশুদের প্রতি সহানুভুতিশীল নয়। গবেষনায় সবচেয়ে খার অবস্থা পাওয়া গেছে মামলা পরিচালনাকারি আইনজীবীদের ব্যাপারে। তারা এ মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে একটা শিশুর দুরবস্থার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে। গবেষণায় দেখা যায় গ্রেফতারকৃত শিশুরদের সংখ্যা মূল সমস্যা নয় কিন্তু আসলে এদের জন্য ন্যঅয় বিচার এবং বিরোধ নিস্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। গবেষণাটিতে কারাগারে আটক শিশু-কিশোর অপরাধীদের বিচার ব্যবস্থার ধরন ও প্রকৃতি এবং আইনের প্রতি উদাসীনতা ও অপপ্রয়োগ সম্পর্কে বাস্তব ধারণা প্রদান করেছে। কিন্তু গবেষণাটিতে পারিসংখ্যানিক তথ্যের কোন ধরণের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়নি। গবেষণাটিতে কি ধরনের প্দধতি ব্যবহার করা হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়নি। তাছাড়া কোনও ধরনের সুপারিশ ও সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা হয়নি যা করা গবেষণাটি অধিক গ্রহণযোগ্য ও প্রতিনিধিত্বশীল হতো। তবে কারাগারে আটক কিশোর অপরাধীদের বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ ও উদাসীনতা সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং এসব অব্যবস্থাপনার ও অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার, এন,জি,ও আর্ন্তজাতিক সংগঠন এবং নবীন গবেষকদের দিক নির্দেশক হিসেবে গবেষণাটি ভূমিকা রাখবে (অধিকার, ২০০১)।

কিশোর অপরাদ একটি সামাজিক সমস্যা যা সমজা জীবনে সুদূর প্রসারী নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। একটি দেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় জনগোষ্ঠী শিশু-কিশোর শ্রেণী নানা রকম অপরাধ কর্মে জড়িয়ে পড়ার ফলে জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি বাধার সম্মুখীন হয়। নানা কারণে তারা অপরাধকর্মে জড়িয়ে পড়ে। যেসব কারণে কিশোররা অপরাধকর্মে জড়িয়ে পড়ে এবং সমাজ জীবনে তা কিভাবে প্রভাব ফেলে সে বিষয়েই এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। কিশোর অপরাধ প্রপঞ্চটি কিভাবে অন্যান্য সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় ও পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কযুক্ত তাও এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে বিষয়গুলো আলোচনা ও বিশ্লেষণের জন্য বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। কিশোর অপরাধ প্রবণতা নিয়ন্ত্রণের জন্য কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং এক্ষেত্রে সমাজকর্মীগণ কি ভূমিকা পালন করতে পারেন সে সম্পর্কেও প্রবন্ধটিতে আলোকপাত করা হয়েছে।

তিনি তার প্রবন্ধটিতে কিশোর অপরাধের জন্য যে সব কারণকে দায়ী হিসেবে দেখিয়েছেন সেগুলো হল- দারিদ্র ও অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা, আবাসিক সমস্যা বস্তি প্রভাস, শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভা, পিতামাতার অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ, মাত্রাতিরিক্ত আদর বা আদর যত্নের অভাব, নিয়ন্ত্রণহীনতা, অনুকরণপ্রিয়তা, এ্যাডভেঞ্চার প্রিয়তা, সঙ্গদোষ, গঠনমূলক চিত্তবিনোদনের অভাব, গণমাধ্যমের নেতিবাচক প্রভা, শ্রমলব্ধ নগদ অর্থের অভাব, অনুকুল ভৌগলিক পরিবেশ, আর্শহীনতা ইত্যাদি। উক্ত প্রবন্ধটিতে তিনি কিশোর অপরাধের ধরন সমূহ তুলে ধরেছেন একজন গবেষকের গবেষণা প্রাপ্ত ফলাফল থেকে যাতে বাংলাদেশে সচরাচর যে ধরনের কিশোর অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে এ সম্পর্কে ৪০ জন কিশোর অপরাধী, ৭০ জন অভিভাবক এবং ৩০ জন সামাজিক প্রতিনিধি এর মতামত ভিত্তিতে সেই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছিল। এতে ২১ ধরনের কিশোর অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও উক্ত গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে তিনি দেখিয়েছেন সবচেয়ে বেশি বাড়ি থে টাকা পয়সা চুরি ও অন্যান্য জিনিসপত্র চুরি সংক্রান্ত অপরাধে শতকরা ১০০ ভাগই অপরাধকৃত কিশোররা এবং অভিভাবক সম্মতি দিয়েছে এবং শতকরা ৪৩ ভাদ মতামত দিয়েছে সামাজিক প্রতিনিধিরা এবং পরবর্তী অপরাধটি হচ্ছে স্কুল পালানো। স্কুলে মনোযোগের অভাব এই কারণের পক্ষে শতকরা ৯৫ ভাগ কিশোররা মতামত দিয়েছে এবং শতকরা ৯১ ভাগ মতামত দিয়েছে অভিভাবকরা এবং শতকরা ৪৬ ভাগ মাতমত দিয়েছে সামাজিক প্রতিনিধিরা। এছাড়াও আরও অপরাধ ছিল উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ প্রবণতার গতি প্রকৃতির একটি অনুমান তুলে ধার হয়েছে জাতীয় কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী যাতে ২ মার্চ ২০০০ইং তারিখে উক্ত প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত ১৮২ জন কিশেরা অপরাধীর সংখ্যা দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে সেই সময় পিটিশন কেসে ৮০ জন, জি,আর কেসে ২৩ জন, প্রবেশনাধীন ১৩ জন, ছুটিরত ১০ জন এবং কিশোর হাজতে পিটিশন কেসে ৯ জন , জি, আর কেসে ৪৭ জন কিশোর অপরাধী অবস্থান করেছিল। এছাড়াও এতে আরও উল্লেখ করার মত ছিল অপরাধ অনুসারে আটককৃত শিশুদের শ্রেণীবিন্যাস, তাতে দেখতে পাওয়া যায় প্রায় ১৩ ধরণের দন্ড বিধি বা শিশু ধারায় ৫৬ জন শিশু অপরাধী ১২ ধরণের অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত এবং আটক অবস্থায় আছে। প্রবন্ধটিতে সর্বশেষ যে জিনিসটি তুলে ধরা হয়েছে তা হলো ১৯৮০ সাল থেকে শুরু করে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত বিচারাধীন কিশোর অপরাধের মাত্রা তুলনা করতে গিয়ে দেখতে পাওয়া যায় যে, ক্রমবর্ধমান হারে বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের মাত্রা ক্রমশ বেড়ে চলছে যা জাতির ভবিষ্যৎ অশনি সংকেত।

আলোচ্য কিশোর অপরাধের পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ সম্পর্কে বাস্ত ধারণা প্রদানে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু প্রবন্ধটিতে পারিসংখ্যানিক তথ্যের কোন ধরণের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়নি। তাছাড়া কিশোর অপরাধে অভিযুক্ত কিশোর অপরাধী ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সমূহ, কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ সংশোধনমূলক প্রক্রিয়া সমূহ তুলে ধরা হয়নি। এমনকি কোন ধরণের সুপারিশ ও সীমাবন্ধতা উল্লেখ করা হয়নি। যা করা হলে প্রবন্ধটি আরও সমৃদ্ধ ও প্রতিনিধিত্বশীল

Dhaka University Institutional Repository

হতো। তবে কিশোর অপরাধ সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই প্রবন্ধটিতে (মোঃ আনোয়ার হোসেন, ২০০২)।

টঙ্গী কিশোর সংশোধনী কেন্দ্রের অব্যবস্থাপনা ও কষ্টকর জীবন কিশোরদের কিভাবে আরও বেশি অপরাধমূখী করে তুলেছে সে সম্পর্কে আফরোজা নাজনীন তার প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। তিনি তাতে উল্লেখ করেন যে, মেয়াদ শেষে কেন্দ্র ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর এক বছরের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ কিশোর অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। তিনি সেখানে জানতে পারেন খাদ্য, চিকিৎসা, পোশাক ও বিনোদন সুবিধা বঞ্চিত অবস্থায় কিশোররা মানবেতর জীবন যাপন করে। সেখানে কিশোরদের সাথে দেখা করতে আসা অনেক বাবা, মা তাকে জানান ঠিকমত কিশোর নিবাসীদের খাবার দেওয়া হয় না। হ্যান্ডকাপ পরিয়ে রাখা হয়। নেই কোন পেশাদার মনোবিজ্ঞানী, নেই চিকিৎসক, কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হলেও মাত্র পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানকার কর্মকর্তারাতো বটেই একটু বড় কিশোররাও ছোটদের অবলীলায় কিল ঘুষি মারে। সামান্য অপরাধে জোটে লাথি, এমনকি উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখার উদাহরণও আছে। এ ধরনের বঞ্চনা থেকেই এখানকার কিশোরদরে মধ্যে সৃষ্টি হয় ক্ষোভ। সংশোধন কেন্দ্রের অনিয়ম সহ্য করতে না পেরে প্রায়ই তারা ঘটায় বিভিন্ন ধরণের অপরাধমূলক ঘটনা, ২০০৩ সালে এ কেন্দ্রে ৮ জন কিশোর ব্লেড ও ভাঙ্গা বোতল দিয়ে আত্নহত্যার চেষ্টা চালায়। ২০০২ সালে ১২ জন পালানোর চেষ্টা করে। ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কেন্দ্রে ২০০ জন কিশোর নিবাসী থাকতে পারে। তখনকার সময়ে সেখানে ছিল ১৩৫ জন কিশোর। যার মধ্যে অভিভাবকরা দিয়ে গেছে ১৯ জনকে। তার মধ্যে ১৫ জন সাজা প্রাপ্ত, ৪ জন বিচারাধীন। পুলিশ সোপর্দ করেছে ১১৬ জনকে। এদর ২৬ জন সাজা প্রাপ্ত, ৯০ জন বিচারাধীন। এদর বয়স ছিল ৮-১৬ বছর। সেখানে অপরাধীদের মধ্যে মাদক পাচার, অস্ত্র ও বোমা বহন, খুন, রাহাজানিসহ সব ধরনের অপরাধ যুক্ত আসামী ছিল।

তিনি তার প্রবন্ধে আরও উল্লেখ করেন দিন দিন অস্ত্র, বোমা পাচারকারীর সংখ্যা বাড়ছে সেই সাতে এই সম্সত অপরাধীদের মধ্যে অনেকেই দেশের শীর্ষ সন্ত্রাসীদের সহযোগী হিসেবেও কাজ কের থাকে। এরা মাদকসেবী এমনকি সমকামীতায় অভ্যস্ত। সংশোধন কেন্দ্রে অপরাধের ধরন অনুসারে কিশোরদের পৃথক কয়েদখানায় রাখা হয়। গুরুতর অপরাধীরা বিনোদনের সুযোগ পায় না। তবে ভালো খাবার দেওয়া হয়। তিনি তার প্রবন্ধে আরও উল্লেখ করেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সূত্রে জানা যায় ঢাকায় ১২ বছরে ১৩ গুণ কিশোর অপরাধী বেড়েছে। ৯০ সালে মোট ৪৪ জন কিশোর গ্রেফতার হয়। ২০০২ সালে ৫৫৬ জন, ২০০৪ সালে এ সংখ্যা ৫ হাজারের ওপরে। পুলিশের হাতে গ্রেফতারকৃত ২০ শতাংশেরই বয়স ১৬ বছরের নিচে। এরা সবাই বস্তিবাসী। কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের ধরনেও পরিবর্তন এসছে। ৯০ সালে কিশোরদের হাতে ডাকাটি, অস্ত্র ও বিস্ফোরক বহন, ব্যবহার ও নারী নির্যাতনের ঘটনা ছিল খুবই কম। ঐ বছর মাত্র একজন কিশোর ঐ সব মামলায় অভিযুক্ত হয। এমনকি তখন কোন কিশোরের নামে মাদক সংক্রানত মামলা হয়নি। কিন্তু এখন এসব অপরাধের ঘটনা দিন দিন বাড়ছে। সংশোধনী কেন্দ্র ছেড়ে চলে যাওয়ার পর এক বছর অপরাধীর কার্যক্রম অনুসরণ করা হয। এতে দেখা যায়, শতকরা ৪০ ভাগ কিশোর এক বছরের মাথায় আবার অপরাধ জগতে ফিরে আসে।

আলোচ্য, প্রবন্ধটিতে কিশোর সংশোধনী কেন্দ্রের কিশোর অপরাধে অভিযুক্ত কিশোর নিবাসীদের মানবেতর জীবনযাপন সম্পর্কে তুলে ধরা হলেও এতে কোন কিশোর নিবাসীর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়নি, এবং উক্ত সমস্যা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ অবগত কিনা, তা উল্লেখ করা হয়নি। তথাপিও প্রবন্ধটি সংশ্লিষ্ট

কর্তৃপক্ষ, গবেষক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যারা কিশোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে কাজ করছে তাদের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে (আফরোজা নাজনীন, ২০০৫)

৫.২ বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত কিশোর অপরাধ চিত্র

ক. ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজের তাসনুভা নামে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় সে আত্মহত্যা করে বলে কলেজ কর্তৃপক্ষের ধারণা। তার বাড়ি কুচ্ছিয়ায়। তাসনুভার বাবা মো: একরাম একজন এনজিও কর্মকর্তা। তার লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।(দৈনিক আমাদের সময়, ৩০.১১.২০০৮)

খ.১৯৯০ থেকে ১৯৯৪ সন পর্যন্ত এই ৫ বছরে পুলিশের ডায়েরি মতে, শুধু ঝিনাইদহ জেলায় ৬১ জন শিশু, ১৯১ জন কিশোর ও ৪৩৬ জন কিশোরী আত্মহত্যা করে। (দৈনিক ইত্তেফাক, ২২. ৩. ১৯৯৫)

গ. কোতোয়ালী থানা পুলিশ ২০০৮ এর ১৫ই জুলাই পাট গুদাম হাফেজিয়া মাদ্রাসার ছাত্র নাজমুল হাসান বাবু (১২) হত্যা রহস্য উদঘাটন এবং হত্যার সহিত জড়িত একই মাদ্রাসার ছাত্র হামিদুল ইসলাম (১৪) ও আবদুর রহমান মুন্না নামের অপর এক কিশোরকে গ্রেফতার করিয়াছে। পুলিশ নিহত বাবুর অপহৃত সাইকেল ও হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত দা উদ্ধার করিয়াছে। উল্লেখ, ১২ই জুলাই রাত্রে শহরের কেওয়াটখালী নিবাসী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকশন অফিসর এমরান হোসেনের পুত্র নাজমুল হাসান বাবুকে জবাই করিয়া হত্যা করা হয় ।হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে ধৃত কিশোরদের স্বীকারোক্তিতে জানা যায়, নিহত বাবু ৫ জুলাই পাট গুদাম হাফিজিয়া মাদ্রাসা হইতে হেফজ সম্পূর্ণ করায় তাহার পিতা তাহাকে একটি সাইকেল কিনিয়া দেয়। বাবু সাইকেল নিয়ে রাস্তায় বাহির হলে তার সহপাঠী কোতয়ালী থানার চর নিকলিয়ার হামিদুল ইসলাম চালানোর জন্য বাবুর নিকট সাইকেলটি চায়। বাবু সাইকেল না দেয়ায় উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে বাবু হামিদুলকে চপেটাঘাত করে। হামিদুল তাহার বন্ধু কোতয়ালী থানার মড়াখোলার আবদুল জলিলের পুত্র আবদুর রহমানকে ওরফে মুন্নাকে ঘটনা অবহিত করে এবং বাবুকে মারিয়া ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এরপর ১২ ই জুলাই রাত্রি সাড়ে আটটায় এক বাড়িতে কুরআন খতমের দাওয়াতের কথা বলিয়া একই সাইকেলে তিনজন রওয়ানা হয়। পথের মধ্যে পাওয়ার হাউজের দৌয়ালের পাশে হামিদুল অতর্কিত বাবুকে জাপটাইয়া ধরে মাটিতে ফেলে দিয়ে দুইজন মিলে দা দিয়ে তাকে জবাই করে ফেলে রাখে। ঘটনার পর হমিদুল ও মুন্না সাইকেলযোগে চলে যায়। (দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮.০৭.১৯৯৬)

ঘ. পকেটমার আরিফ হোসেন (১৬) বয়সে কিশোর হলেও কাজে সে ভয়ঙ্কর। চার বছরে শতাধিক মোবাইল ফোন সেট চুরির অভিজ্ঞতা আছে তার। সুযোগ পেলে আস্ত্রের মুখে পণবন্দী করেও পথচারীদের ফোন ও টাকা লুটে নেয়। এসব অপরাধে এ পর্যন্ত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে চারবার। তবে কিশোর হওয়ার সুবাদেই বারবার ছাড়া পেয়ে যায়। আরিফ ও তার সহযোগী কিশোর অপরাধী রাজ্জাক মূলত বাস বা জনবহুল স্থানে পকেট মারে। প্রতিপক্ষ তাদের থেকে দুর্বল হলে তখন পকেটমার থেকে তারা ছিনতাইকারীতে পরিণত হয় তাদের টার্গেট মূলত জনসাধারণের পকেটে থাকা মোবাইল সেট ও মানিব্যাগ। পকেটমার হিসেবে দুজনই খুব দক্ষ। পকেট কেটে এ পর্যন্ত এক থেকে দেড়শটি মোবাইল ছিনতাই করেছে। ছিনতাইকৃত মোবাইল বিক্রি করে গুলিস্তান স্টেডিয়াম মার্কেটের মফিজ ভাই, নজু ভাইসহ অনেকের কাছে। তবে বয়সে ছোট হওয়ার কারণে ন্যায্যমূল্য পায় না

তারা। সে জানায়, নোকিয়া এন সিরিজের একটি মোবাইল আনতে পারলে তাদের মাত্র ৬ থেকে ৭ হাজার টাকা দেয়া হয়। বেশি টাকা চাইলে বড় ভাইয়েরা পুলিশে দেয়ার ভয় দেখায়। এ পর্যন্ত বিভিন্ন অপরাধে আরিফ চারবার পুলিশের কাছে ধরা পড়েছে। তবে বয়স কম থাকায় প্রতিবারই সে বেরিয়ে এসেছে। সে জানায়, আগে ছাড়া পেলেও এবার মনে হয় পাব না ।আরিফের গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে। অভাবের তাড়নার লেখাপড়া বাদ দিয়ে ছয় বছর আগে এক প্রতিবেশীর সাথে ঢাকায় আসে। এখানে এসে পুরান ঢাকার একটি ওয়ার্কশপে ওয়েলিংয়ের কাজ শেখে। সেখানে জাহাঙ্গীর নামে এক ব্যক্তির সাথে পরিচয় হয় তার। এ জাহাঙ্গীর যে ছিনতাই ও পকেটমার শেখানোর ওস্তাদ তা সে জানত না। এক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে জাহাঙ্গীর তাকে পকেটমার শেখায়। এরপর থেকে চলতে থাকে ছিনতাই ও পকেটমার। আরিফ ও রাজ্জাক মূলত একসাথে পকেট কাটার কাজ করে থাকে। এ কাজের জন্য তাদের কিছু সাঙ্কেতিক শব্দ রয়েছে। বুকপকেটকে বলে বুককান, পাঞ্জাবী বা প্যান্টের ঝুল পকেটকে নিচকান ও প্যান্টের পেছনের পকেটকে বলে থাকে পিচকান। বাস বা জনবহুল স্থানে পকেট কাটার জন্য তারা এক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে। এরপর ওই ব্যক্তির পিছু নেয়। সাধারণত রাজ্জাক ওই ব্যক্তির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিজের শরীর চুলকাতে থাকে। রাজ্জাকের হাত নাড়াচাড়ার এক ফাঁকে আরিফ ওই ব্যক্তির পকেটে হাত ঢুকিয়ে নিয়ে যায় তার মূল্যবান জিনিসপত্র। হাত দিয়ে সহজভাবে কাজ সম্পন্ন না হলে সে ক্ষেত্রে বে-ড ব্যবহার করা হয়। আর পকেট কাটার জন্য সব সময় জিলেট কোম্পানীর উন্নতমানের দামি বে-ড ব্যবহার করে থাকে বলে সে জ া নায়। (দৈনিক নয়া দিগন্ত, ৫-৪-২০০৮)

ঙ. দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ুয়া এক স্কুলছাত্রী শিমুকে ধর্ষণ করেছে দুর্বৃত্তরা। কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার বিদ্যানগর গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটে ।এলাকাবাসী জানায়, প্রতিবেশী লুৎফর রহমানের পুত্র হুমায়ুন (১৮) ও হযরত আলীর পুত্র শাকিল (১৫) দুজন মিলে ৮ বছর বয়সী দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী শিশুটিকে ধরে জোরপূর্বক একটি টমেটো ক্ষেতে নিয়ে যায়। সেখানে হুমায়ুন ও শাকিল পালাক্রমে শিশুটিকে ধর্ষণ করে। এ সময় শিশুটির কান্না ও আর্তচিৎকার শুনে অশপাশের লোকজন ছুটে এসে শিশুটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে এবং উপজিলা স্বাস্থ্য কমপে-ক্সে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে শিশুটির শারীরিক আবস্থায় আরো অবনতি হলে তাকে কিশোরগঞ্জের সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ঘটনার পরপর দুষ্কৃতিকারী হুমায়ুন ও শাকিল পালিয়ে যায়। দৈনিক অপরাধকণ্ঠ, ০৫-০১-২০০৯।

চ. কিশোর অপরাধীর সংখ্যা বাড়ছে। অস্ত্র চালাতেও ওরা পারদশী। মাদক কেনাবেচা, সেবন, চাঁদাবাজি, পকেটমার, ছিনতাইসহ নানা অপরামূলক কর্মকাণ্ডে এরা সিদ্ধহস্ত। এমনকি ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতেও এদের বুক কাঁপে না। এমনই এক লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টায় মালিবাগ টুইনটাওয়ারের গলিতে। চার কিশোর প্রকাশ্যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ফুটপাথের চা বিক্রেতা মোক্তার হোসেনকে (১৬) খুন করেছে। জনতা এদের ধাওয়া করলে তারা রিক্সাচালক মুন্নাকে (৩০) কুপিয়ে আহত করে। এ ঘটনার মূল হোতা রুবেলকে (১৭) রক্তাক্ত ধারালো ছোরাসহ আটক করে গণধোলাই দেয় উত্তেজিত জনতা। এ ঘটনায় নিহতের বড় ভাই দেলোয়ার হোসেন বাদী হয়ে ৪ কিশোর অপরাধীকে আসামি করে পল্টন থানায় মামলা করেছে। এ ব্যাপারে তদন্তকারী কর্মকর্তা পল্টন থানার এসআই মোঃ কামরুজ্জামান জনকণ্ঠকে জানান, শুক্রবার দুপুরে খাওয়াকে কেন্দ্র করে নিহত মোঃ মোক্তারের সঙ্গে আসামি রুবেলের ঝগড়া ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এর মাত্র ৬ ঘণ্টার ব্যবধানে কিশোর রুবেল তার তিন বন্ধু মিলে মালিবাগ আবুজর গিফারী কলেজের পিছনে নির্জন স্থান পরিত্যক্ত গোডাউনে বসে চা বিক্রেতা মোক্তার হোসেনকে খুন করার পরিকল্পনা করে। এ সময় রুবেলসহ তার তিনবন্ধু ধারালো

Dhaka University Institutional Repository

ছোরা, চাপাতি নিয়ে রাত সাড়ে ৮টায় মোক্তার হোসেনকে কলার চেপে ধরে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। এ সময় জনতা রুবেল ও তার তিন বন্ধু খোকন (২০), মারুফ (১৭), আলআমিনকে (১৬) ধাওয়া করে। চার কিশোর ধারালো ছোরা ও চাপাতি ঘুরিয়ে পালানোর চেষ্টা চালায়। এ সময় তারা রিক্সাচালক মুন্নাকে কোপায়। পরে জনতা রুবেলকে রক্তাক্ত ছোরাসহ ধরে গণধোলাই দেয়। ডিএমপি পুলিশের এক উর্ধতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, রাজধানীর ৪১টি থানায় প্রায় ৫ শতাধিক ভয়ঙ্কর কিশোর অপরাধী রয়েছে। এরা ৫শ' থেকে এক হাজার টাকায় একজন মানুষকে খুন করতে ভাড়া খাটে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে পুরনো ঢাকার বংশাল থানার আলুবাজার এলাকায় ৭০ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার হাজী আহমদ হোসেনকে খুন করে কিশোর অপরাধীরা। আর মিরপুর, পল্লবী, শাহ আলী, কাফরুল এলাকায় সবচেয়ে বেশি কিশোর অপরাধী রয়েছে। এদের চাঁদাবাজি কাজে লাগাচ্ছে শীর্ষ সন্ত্রাসী শাহাদাত। এরা অস্ত্র একে অন্যের কাছে পৌঁছার কাজ করে। আর এখানে মাদক কেনাবেচা ও ছিনতাই এদের প্রধান পেশা। গত ১ মাসে এই চার থানার এলাকায় চাঁদা না দেয়ায় ১০ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছে এসব কিশোর অপরাধীর হাতে। একই অবস্থা পুরনো ঢাকার। সম্প্রতি নিুবিত্ত অঞ্চল কামরাঙ্গীরচরের বিভিন্ন অলিতে-গলিতে কিশোর অপরাধীদের উৎপাত বেড়েছে। (দৈনিক জনকণ্ঠ, ০৮-০৩-২০১০)

ছ. ইয়াবাই হত্যা করেছে ঐশীর বাবা-মাকে। কিশোরী ঐশীর হাতে তার পিতা পুলিশ ইন্সপেক্টর মাহফুজুর রহমান ও মাতা স্বপ্না রহমানের হত্যাকাণ্ড নিয়ে দেশব্যাপী মানুষের বিবেক নাড়া দিয়েছে। সন্ত ান পিতা-মাতাকে হত্যা করতে পারে একথা বিশ্বাস করতে পারছেন না অনেকে। অনেকে বলেছেন তারা এমন নিষ্ঠুর ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড কখনও দেখেননি। সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু মনোরোগ চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী ও অপরাধ বিশেষজ্ঞরাও বলেছেন, কোন সন্তান পিতা-মাতাকে খুন করতে পারে না। কিন্তু ঐশী তার পিতা-মাতা খুন করেনি। করছে মাদকাসক্ত ঐশী। এ ঐশী স্বাভাবিক ঐশী নয়। মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন, ইয়াবা সেবনের পর ঐশী নিষ্ঠুর, হতাশাগ্রস্ত ও নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। সেই ঐশী পিতা-মাতাকে খুন করেছে। তরা বলেছেন, ইয়াবা তরুণ সমাজকে গ্রাস করে ফেলেছে। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। জাতিকে রক্ষা করতে হলে কিংবা স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে চাইলে রাজনীতি নিয়ে হৈ চৈ না করে সমজাকে রক্ষা করতে সকল রাজনৈতিক দল সম্মিলিতভাবে সর্বনাশা ইয়াবার আগ্রাসন ঠেকাতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের অতিরিক্ত পরিচালক (ঢাকা অঞ্চল) আবু তালেব ও উপ-পরিচালক (ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল) মুজিবর রহমান পাটোয়ারি বলেন, কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও আশেপাশের সীমান্ত দিয়ে বস্তায় বস্তায় ইয়াবা আসছে। দীর্ঘদিন ধরে এ সীমান্ত দিয়ে সিংহভাগ ইয়াবা ট্যাবলেট আসে। বর্তমানে দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকেও ইয়াবা আসছে। মিয়ানমারে আছে ইয়াবা তৈরির কারখানা। সেখানে একটি ট্যাবলেটের মূল্য ১০ থেকে ১৫ টাকা। বাংলাদেশে নিে ২শ থেকে ৫শ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয় প্রতি ট্যাবলেট। এদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইয়াবা আসক্তদের সংখ্যা সর্বাধিক। এছাড়া মেডিক্যালসহ নামিদামি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যেও ইয়াবা আসক্তদের সংখ্যা যথেষ্ট।গ্রামাঞ্চলেও ইয়াবা বেচাকেনা চলছে ব্যাপক হারে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের আরও তিন কর্মকর্তা বলেন, ইয়াবা টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত অর্থাত শহরে এমন কোন এলাকা কিংবা পাড়া-মহল্লা ও গ্রাম নেই যেখানে ইয়াবা ট্যাবলেট হাত বাড়ালে পাওয়া যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াবাই ঐশীদের খুনি বানিয়েছে ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. আজিজুর রহমান বলেন, ঐশী রহমানের প্রতি পিতা-মাতার সম্পর্কে দূরত্ব ছিল। স্বাভাবিক জীবনের বাইরে গিয়ে বখাটে ও ইয়াবা আসক্ত তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে মেলামেশা করে নিজে ইয়াবায় আসক্ত হয়ে পড়ে। পিতা-মাতা এ বিষয় যখন টের পেলেন তখন ঐশীর প্রতি চরম মানসিক নির্যাতন করেন। তারা তাকে ঘরে বন্দি করে রাখাসহ নানা ধরনের নিপীড়ন করতে থাকেন। ইয়াবা আসক্ত ঐশী ন্যায়-অন্যায় কিংবা ভালমন্দ বিচার করার বিবেচনা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সে মনে করে, তার পিতা-মাতাই তার শত্রু। তার পাগলামি বেড়ে যায়। তাদের সরিয়ে দিলে ঐশী ঠিকমত ইয়াবা খেতে পারবে। এটাই সারাক্ষণ তার ভেতর কাজ করেছে। যে কারণে ঐশী তার পিতা-মাতাকে হত্যা করতে দ্বিধা করেনি। তার ভিতর কোন অনুশোচনা হয়নি। পিতা-মাতা তাকে ঘরে আটক না রেখে তার চিকিতসা করালে বা মায়া-মমতা দিয়ে তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারতেন। কিন্তু তারা তা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. শামীম ফেরদৌস করিম একই মতামত করে বলেন, ইয়াবা আসক্ত সমস্ত তরুণ-তরুণীই ঐশীর মত স্বভাবের হওয়া স্বাভাবিক। চর্ম ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাঃ এমএন হুদা বলেন, ইয়াবা সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। অনেকে মনে করে ইয়াবা খেলে স্লিম, চেহারা সুন্দর হয় ও দীর্ঘক্ষণ পড়াশোনা করা যায়। পাশাপাশি যৌন উত্তেজনা বেড়ে যায়। এসব কথা বলে শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীরা আসক্ত হয়ে পড়ে। চলচ্চিত্র জগতেও এর ব্যবহার বেশি। ইয়াবা খেলে ক্ষুধামন্দা ও ঘুম কম হয়। প্রথম কিছুদিন ভাল লাগে। যৌন উত্তেজনা কিছুদিন থাকে। এরপর স্থায়ী যৌন উত্তেজনা কমে যায়। যা চিকিতসায়ও ভাল হয় না। ইয়াবা আসক্তরা ক্রুদ্ধ স্বভাবের হয়ে ওঠে। তখন এরা পরিপূর্ণ অস্বাভাবিক লোক হয়ে পড়ে। তখন তাদের পক্ষে সব কিছু করা সম্ভব। ইয়াবা ব্রেন থেকে প্রায় সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বংস করে দেয় বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। ইয়াবা একটি মানুষ খুন করা উপকরণ।

একটি মাদকাসক্ত কিশোরী খুনি, সন্তান খুনি নয় ॥ খ্যাতিমান মনোরোগ বিজ্ঞানী ডাঃ মোহিত কামাল বলেন, সন্তান কখনও পিতামাতাকে খুন করতে পারে না, ঐশীও খুন করেনি। করেছে সর্বনাশা ইয়াবা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী সেনাবাহিনীদের ক্ষিপ্রতা বাড়াতে ও স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধি নষ্ট করে দিয়ে নিষ্ঠুরতা বাড়াতে এবং দীর্ঘসময় নিদ্রাহীন থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য এমপিটাভিন, যার ফর্মাসিয়াম নাম ইয়াবা ট্যাবলেট হিটলারের পরামর্শে সরবরাহ করা হয়। ঐ সময় সেনাবাহিনী এই ট্যাবলেট খেয়ে চরম নিষ্ঠুর আচরণ করত। এরপর এ ট্যাবলেট ক্ষতিকর দিক নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া শুরু হলে ইয়াবা নিষিদ্ধ করা হয়। ইয়াবা খেলে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কার্যক্রম নষ্ট হয়ে যায়। স্বাভাবিক মানুষটি তখন অস্বাভাবিক অর্থাত অমানুষ হয়ে পড়ে। তার ভিতর চরম নিষ্ঠুরতা, নিয়ন্ত্রণহীন জীবন, ক্ষিপ্রতা ও হিংস তা বেড় যায়। ইয়াবা রাসায়নিক দ্রব্যগুলো শরীরে গিয়ে একাজ করে। তখন পিতা-মাতা তার প্রতি ভাল আচরণ, মায়ামমতা নিয়ে সুচিকিতসা করলে কোমলমতি সন্তানদের স্বাভাবিক জীবনে নিয়ে আসতে পারে। ঐশীর ক্ষেত্রে পিতা-মাতার তা না করে তাকে আটক রেখে ও নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন। তাই পিতা-মাতাকে হত্যা করেও তার হিংস তা হরাস পায়নি। অপরদিকে ঐশীর পিতা গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করতেন। কোন মহল টার্গেট করে তাকে ইয়াবার মাধ্যমে সর্বনাশা পথে নিয়ে যেতে পারে। তিনি বলেন, তার কাছে সমাজের উচ্চ পর্যায়ের লোকজনও ইয়াবা আসক্ত সন্তানদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন। ভাবতে অবাক লাগে সমাজপতি, বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজের অনেকের সন্তানও ইয়াবা আসক্ত। তার মতে, এমন কোন স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা মেডিক্যাল কলেজ নেই, যেখানে ইয়াবায় আসক্ত নেই। রাজনীতিতে কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ি বাদ দিয়ে সম্মিলিত উদ্যোগ নিয়ে সর্বনাশা ইয়াবার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য তিনি আহ্বান জানান। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. গোলাম রাব্বানীও একই

মতামত পোষণ করেছেন। পুলিশের আইজি হাসান মাহমুদ খন্দকার জানান, শিক্ষিত তরুণরা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি মাদকের বিরুদ্ধে সকল স্তরের মানুষের সমন্বয়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আবেদন জানান তিনি। (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯.০৮,২০১৩)

জ) পুলিশ কর্মকর্তা দম্পতি হত্যা, মা-বাবাকে একাই খুন করেছে ঐশী? পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) পরিদর্শক মাহফুজুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী স্বপ্না রহমানকে তাঁদের মেয়ে ঐশী রহমান একাই খুন করেছে বলে দাবি করেছে পুলিশ। শনিবার বিকেলে রাজধানীর মিন্টো রোডে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া সেন্টারে সাংবাদিকদের কাছে এ দাবি করেন পুলিশের কর্মকর্তারা। এদিকে গতকাল আদালতে দেওয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতেও ঐশী নিজেই তার বাবা-মাকে খুনের কথা স্বীকার করেছে বলে আদালত সূত্রে জানা গেছে।জবানবন্দি দেওয়ার পর ঐশী ও গৃহকর্মী খাদিজা ওরফে সুমিকে গাজীপুরের কিশোর সংশোধনাগারে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় গ্রেপ্তার ঐশীর বন্ধু মিজানুর রহমান ওরফে রনিকে আরও পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।গতকাল সংবাদ ব্রিফিংয়ে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার মনিরুল ইসলাম বলেন, ঐশী একাই তার বাবা-মাকে খুন করার কথা বলেছে। বাবা-মা নাকি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়তে বাধ্য করেছে। এগুলো তার পছন্দ হয়নি। এরপর সে লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে। ঘটনার সাত-আট দিন আগে সে সিদ্ধান্ত নেয়, বাবা-মাকে খুন করে সে স্বাধীন হবে। মনিরুল বলেন, সাধারণত একটি হত্যাকাণ্ডে অনেকেই বিভিন্নভাবে জড়িত থাকে। এ হত্যাকাণ্ডে ঐশী ছাড়া আর কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঐশীর এক বন্ধুকেও খোঁজা হচ্ছে।

১৬ আগস্ট সন্ধ্যায় রাজধানীর চামেলীবাগের বাসা থেকে মাহফুজ ও তাঁর স্ত্রীর রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনার পর থেকে মেয়ে ঐশী ও গৃহকর্মী সুমি নিখোঁজ ছিল। ১৭ আগস্ট ঐশী পল্টন থানায় আত্মসমর্পণ করে। তার তথ্যের ভিত্তিতে সুমি ও মিজানুর রহমান ওরফে রনিকে আটক করে পুলিশ। এ ঘটনায় মাহফুজের ভাই মশিহুর রহমান পল্টন থানায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে হত্যা মামলা করেন। ১৮ আগস্ট ঐশী, সুমি ও রনিকে রিমান্ডে নেওয়া হয়। রিমান্ড শেষে গতকাল তাদের আদালতে পাঠানো হয়।

জবানবন্দিঃ আদালত সূত্র জানায়, গতকাল ঢাকা মহানগর মুখ্য আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট আনোয়ার ছাদাতের খাসকামরায় ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয় ঐশী। আদালত সূত্র জানায়, জবানবন্দিতে ঐশী জানায়, ঘটনার আগের দিন জনি নামের এক বন্ধুর কাছে সে হত্যার পরিকল্পনার কথা জানায়। হত্যার পর তাকে আশ্রয় দেওয়ার আশ্বাস দেয় জনি। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ঐশী ছয় পাতার ৬০টি ঘুমের ট্যাবলেট কেনে। ৩০টি করে ট্যাবলেট সে মা-বাবার কফিতে মেশায়। মা-বাবা কফি খাওয়ার পর অচেতন হয়ে পড়েন। এরপর সে প্রথমে বাবাকে ছুরিকাঘাত করে। বাবা গোঙাতে থাকলে ওড়না দিয়ে সে বাবার রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। বাবার গোঙানির শব্দে মা জেগে ওঠেন। মা পানি চান। মাকে পানিও দেয় সে। পানি খাওয়া শেষ হলে মায়ের শরীরে বেশ কয়েকবার ছুরিকাঘাত করে সে। শেষমেশ মায়ের শ্বাসনালিতে ছুরিকাঘাত করে মৃত্যু নিশ্চিত করে। এরপর ঐশী ও গৃহকর্মী মিলে দুজনের লাশ বাথরুমে নিয়ে লুকিয়ে রাখে। রক্ত পরিষ্কার করে সকালে তারা বেরিয়ে যায়।

মাদকাসক্ত ছিল কি না পরীক্ষা হয়নিঃ ঐশীর মাদকাসক্তির ব্যাপারে কোনো পরীক্ষা হয়েছে কি না, জানতে চাইলে পুলিশের কর্মকর্তা মনিরুল বলেন, হত্যাকাণ্ডের সময় সে মাদকাসক্ত ছিল কি না, তা পরীক্ষা করার সুযোগ ছিল না। কারণ, ১৪ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের প্রায় ৬০ ঘণ্টা পর ১৭ আগস্ট সে পল্টন

থানায় এসে আত্মসমর্পণ করে। তাহলে কিসের ভিত্তিতে আপনারা ঐশীকে মাদকাসক্ত বলছেন? জবাবে মনিরুল বলেন, ঐশীর মাদক সংগ্রহের কিছু তথ্য ও আলামত পুলিশের হাতে আছে। খুনের পর ঐশী বাড়ি থেকে চলে গেল কেন? মনিরুল বলেন, সে তার ভাইকে নিয়ে আরেকটি ভাড়া বাসায় থাকার কথা ভেবেছিল। তাই সে কিছু টাকা ও স্বর্ণালংকার নিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে যায়। ৩০টি চেতনানাশক ওষুধ মেশালে কফির স্বাদ তো নষ্ট হওয়ার কথা, সেই কফি কীভাবে মানুষ খেতে পারে? মনিরুল বলেন,ও কফি সম্পর্কে আমার ধারণা নেই। রাত ১১টায় বাসায় ফিরে কেউ কি কফি খেতে চায়? তাঁর জবাব, অনেক মানুষ রাতে ঘুমানোর আগেও কফি খায়। বয়স বিতর্ক এবং পুলিশের বক্তব্য: বয়স বিবেচনায় ঐশী ও সুমিকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা নিয়ে বিতর্ক ওঠে। এ বিষয়ে মনিরুল ইসলাম বলেন, হত্যাকাণ্ডের পর মাহফুজুর রহমানের ভাই মশিহুর রহমান যে মামলা করেছেন, তাতে তিনি ঐশীর বয়স লিখেছেন ১৭। তবে ঐশী ডিবিকে জানিয়েছে ১৮। যে ক্লিনিকে ঐশী জন্মেছে, সেখান থেকেও পুলিশ তথ্য নিয়ে তার বয়স নির্ধারণের চেষ্টা করছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজে তার বয়স নির্ধারণের জন্য পরীক্ষাও করা হয়েছে। এখনো প্রতিবেদন হাতে আসেনি। বয়স-সংক্রান্ত সব তথ্য-উপাত্ত পেলে তা আদালতে দেওয়া হবে। আর শিশু আইন অনুযায়ীই সুমিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে দাবি করেন মনিরুল। (দৈনিক প্রথম আলো, ২৫.০৮.২০১৩)

বর্ণিত ঘটনাগুলো থেকে আমাদের দেশে কিশোর অপরাধের মাত্রা ও ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

কিশোরদের অপরাধের চিত্র

৬.১ অপরাধ জগতের কিশোরদের কয়েকটি চিত্র
৬.২ সামাজিকীকরণের সমস্যায় অপরাধে জড়াচ্ছে কিশোর কিশোরীরা

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

কিশোরদের অপরাধের চিত্র

৬.১ অপরাধ জগতের কিশোরদের কয়েকটি চিত্র ঃ

সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ছুরিকাঘাতে হত্যা। চট্টগ্রাম শহরের এক স্কুলছাত্রকে তার সহপাঠী কর্তৃক একইভাবে হত্যা। গুলশান কালাচাঁনপুরে বাসায় ঢুকে ব্যবসায়ী সাদিকুর রহমান ও তার স্ত্রী রুমানা নার্গিসকে গুলি করে হত্যা । জামালপুরে সহপাঠী কর্তৃক ছাত্র হত্যা। কলাবাগানে দাবিকৃত টাকা না পেয়ে বন্ধুর বাবা-মায়ের ওপর হামলা। খিলক্ষেতের চামড়ারটেকে গার্মেন্টসকর্মী আশার ব্যর্থ প্রেমিক সেলিম সন্ত্রাসী ভাড়া করে আশার প্রেমিক হৃদয় ওরফে পাপ্পুকে পিটিয়ে হত্যা করেছে । সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সংবাদ শিরোনামগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনার ইঙ্গিত দেয় না। সমাজের নিত্য চিত্র বরং প্রতিফলিত হয়েছে এতে। আর এই সংবাদগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে রয়েছে কিশোরদের সম্পৃক্ততা। এই সম্পৃক্ততার বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধানে নামে সাপ্তাহিক। বেরিয়ে আসে কিশোর অপরাধের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের তথ্য। এই নেটওয়ার্কের হয়ে নিষিদ্ধ সব কাজ করে কিশোররা, আর তাদের নিয়ন্ত্রণ করে একটি চক্র। এই চক্রের হোতাদের তালিকায় আছে শীর্ষ সন্ত্রাসী থেকে শুরু করে সমাজের প্রভাবশালীরা। দিন দিন কিশোরদের অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে, তারা জড়িয়ে পড়ছে ভয়ঙ্কর মাদক ব্যবসা, স্মাগলিং ও খুনের মতো ঘটনায়। কিশোররাই হয়ে যাচ্ছে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী। অপরাধ দমনে আইন থাকলেও নেই তার কার্যকর ব্যবহার। কিশোর অপরাধ সংশোধনের চিত্র আরো নাজুক ।নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে ঢাকার কায়েতটুলী এলাকায় বন্ধু কর্তৃক খুন হয় স্কুলছাত্র আশা। এ ঘটনায় দেশজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সামনে চলে আসে কিশোর অপরাধের ব্যাপারটি। আজ দুই দশক পর কিশোর কর্তৃক হিংস্র অপরাধের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি এর সঙ্গে যোগ হচ্ছে বহুবিধ মাত্রা। কখনো কখনো বড় কোনো কারণ, আবার কখনো বা নিতান্তই তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবেগের বশবর্তী হয়ে হত্যাকাণ্ডগুলো সংঘটিত হচ্ছে। কিশোর অপরাধের কারণ বিশ্লেষণে মনোবিজ্ঞানীরা ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে দায়ী করেন। আর সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি ত্রুটিপূর্ণ সামাজিকীকরণ এবং বিদ্যমান সমাজ কাঠামোর দিকে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, সমাজ কাঠামোই মানুষকে অস্বাভাবিক আচরণ করতে বাধ্য করে। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এর জন্য দায়ী। অপরদিকে অপরাধবিজ্ঞানীরা মনে করেন, কিশোর অপরাধ তৈরি হয় সংঘ থেকে। সংঘবদ্ধ এই দলগুলোকে উৎসাহ প্রদানের জন্য ঠিক তাদের চেয়ে বড় এক গোষ্ঠী বসে থাকে, যারা নিজেদের স্বার্থে শিশু-কিশোরদের ব্যবহার করেন।

শীর্ষ সন্ত্রাসীরা উঠতি কিশোরদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করে অপরাধের অন্ধকার জগতে নিয়ে আসছে। এসব ভাগের মধ্যে কিশোর অপরাধীদের কেউ কেউ কেবল অস্ত্র ব্যবসা করে। কারো পরিচয় শূটার হিসেবে। কেউ অস্ত্র বহন ও বিক্রি দুটিই করে থাকে। আবার কোনো কোনো কিশোর শুধু অস্ত্র বহনের কাজে জড়িত। এ গ্রুপটি শুধু নির্দেশমতো নির্ধারিত জায়গায় অস্ত্র পৌঁছে দেয়। কম বয়সে টাকার লোভ দেখিয়ে দাগি সন্ত্রাসীরা তাদের দলে ভেড়ায়। অনেকে আবার বখাটে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে অপরাধের ভয়ঙ্কর অন্ধকার জগতে পা রাখে। অনুসন্ধানে জানা যায়, উঠতি বয়সী কিশোর সন্ত্রাসীদের হাতে রয়েছে অত্যাধুনিক সব অস্ত্র। কখনো ভাড়ায় আবার কখনো শীর্ষ সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে কিশোর সন্ত্রাসীরা এসব আগ্নেয়াস্ত্র পাচ্ছে। ঢাকার আন্ডারওয়ার্ল্ডের আগ্নেয়াস্ত্রের একটি অংশ কিশোর সন্ত্রাসীরা ব্যবহার করছে বলে জানা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

কিছুদিন আগে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ বাড্ডায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেছে আটজন উঠতি কিশোর অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীকে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে পয়েন্ট ২৫ মডেলের অত্যাধুনিক অস্ত্রসহ ২টি বিদেশি পিস্তল। পিস্তলটি যে কিশোরের কাছ থেকে উদ্ধার করেছে তার নাম ইমরান হোসেন ওরফে বিজয় (১৫)। সে বাড্ডা স্কুল থেকে মাত্র নবম শ্রেণী শেষ করে দশম শ্রেণীতে ওঠেছে। আর বিজয়ের কাছে যে অস্ত্রটি রেখেছে, তার বয়স আরো কম। সে মধ্য বাড্ডার আলাতুন নেছা স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। এ ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া বাকি ৪ জনও কিশোর। তাদের বয়স ১৬ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে।

মিরপুর এলাকা থেকে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করা হয় সোহাগ (১৮) নামে এক কলেজছাত্রকে। ৬ হাজার টাকার বিনিময়ে একটি ভারতীয় শূটারগান বিক্রি করতে গিয়ে সে ধরা পড়ে। জিজ্ঞাসাবাদে র‌্যাবের কাছে সোহাগ জানায়, দুই মাস আগে সে অস্ত্র বিক্রির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। তার অস্ত্রটি মিরপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসী শাহাদতের সেকেন্ড ইন কমান্ড গাজী সুমনের। এর আগে গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর কচুক্ষেত ও কাফরুল থেকে ৬ জন কিশোর অপরাধীকে অস্ত্রসহ আটক করে র‌্যাব-৪। তাদের কাছ থেকে ১টি বিদেশি রাইফেল, ২টি রিভলবার ও ৩২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র মিরাজ ও দশম শ্রেণীর ছাত্র সোহাগও ছিল। তারা মিরপুরের সন্ত্রাসী শাহিন সিকদার গ্রুপের ভয়ঙ্কর কিলার।পর্ণোগ্রাফিতে আসক্তি সাইবার ক্যাফে-ইন্টারনেট-মডেম-মেমোরিকার্ডের মাধ্যমে মোবাইল ফোন পর্ণোগ্রাফিতে আসক্ত শিশু-কিশোর প্রতি মাসে কোটি কোটি টাকার পর্ণো ডাউনলোড। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে শিশু-কিশোরদের মাঝে সাইবার পর্নোগ্রাফি ভয়াবহ ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। কোনও একটি পরিবারের অভিবাবক জোরদিয়ে বলতে পারবেন না তার ছেলে কিংবা মেয়ে সাইবার পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত নয়। এটা বুঝবার কোন উপায় নেই। কখন কোন ছেলে কিংবা মেয়ে পর্নোগ্রাফি দেখছে। কেন না এর উপাদান হচ্ছে মোবাইল ফোনের ছোট্ট একটা মেমোরী কার্ড এবং একটা কার্ড রিডার।যা বর্তমানে প্রায় সব ছেলে মেয়ে ব্যবহার করে। অভিবাবকরা জানেন, এসব মেমোরি কার্ড দিয়ে তারা গান লোড করে। কিন্তু এর ভেতরে রয়েছে ভয়ংকর রুচি বিবর্জিত ভিডিও দৃশ্য এবং স্থির চিত্র।

অনেকে আবার ইন্টারনেট সুবিধা সম্বলিত মোবাইল সেট ব্যবহার করে সরাসরি পর্নো সাইটগুলোতে প্রবেশ করছে। সেখান থেকে ডাউনলোড করে তা বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ঘরের কম্পিউটারে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে এসব দেখছে আর ডাউনলোড করে নিচ্ছে অনেকে। বর্তমানে বলতে গেলে সব ছেলে মেয়েরই নিজস্ব কম্পিউটার রয়েছে। তারা পড়াশুনার কাজে এসব কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকে। এ কারনে ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড সংযোগও রয়েছে প্রায় প্রতি বাসায়। যাদের নেই তারা কেবল বিহীন মডেম ব্যবহার করে থাকে।

পুলিশের গোয়েন্দা শাখার কর্মকর্তারা জানান, ধরা পড়া বেশিরভাগ কিশোর অপরাধীর ঘটনার ধরন পিলে চমকানোর মতো। দেখতে সবাই দুরন্ত, চটপটে, কিছুটা ইমোশনাল। পারিবারিক অবস্থাও খুব খারাপ নয়। অথচ এই অল্পবয়সেই কিনা সবাই ঘটিয়েছে চাঞ্চল্যকর সব ঘটনা। খুন, ধর্ষণ, চুরি, ছিনতাই, মাদক সেবন- অপরাধের কোন কিছুই বাদ দেয়নি। অপরাধীর ঘটনার ধরন পিলে চমকানোর মতো। দেখতে সবাই দুরন্ত। চটপটে। কিছুটা ইমোশনাল। দু-একজনের বিচার চলছে আদালতে। অনেকে পালিয়ে গেছে বাবা-মাকে ছেড়ে। সমাজের কাছে হেয় হচ্ছে তাদের পরিবারের লোকজন। বখাটের খেতাব জুটেছে ওইসব ছেলের। এর নমুনা সাম্প্রতিক ঐশির ঘটনা। নিজের পিতামাতাকে নির্মমভাবে

Dhaka University Institutional Repository

হত্যা করেছে। এর একটি নমুনা পাওয়া যায় চট্টগ্রাম নগরীর পাঁচলাইশে ১০১নং ফরহাদ ম্যানশনের চারতলায় নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় হিমাদ্রী মজুমদার নামের এক মেধাবী ছাত্রকে। সে একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়তো। সবার কাছে হিমু নামে পরিচিত ছিল। তার বন্ধুরা নিছক তর্ক করার মতো বিষয় নিয়ে তার ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে। তাকে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে বাড়িতে ডেকে নেয় জুনায়েদ আহমেদ রিয়াদ, ড্যানি, শাহাদাৎ হোসেন সাজু ও শাওন নামের ৪ জন। এরপর জোর করে বাড়ির ছাদে তুলে নিয়ে যায়। সেখানে একবন্ধুর রাখা ৩টি জার্মান প্রজাতির হিংস্র কুকুর বেঁধে রাখা হয়েছিল। হিমুর বন্ধুরা তাকে জোর করে সেই কুকুরের খাঁচার ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। এরপর কুকুরগুলো হিমুকে কামড়াতে থাকে।

শেষমেশ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে হিমু ছাদ থেকে নিচে পড়ে যায়। পরে তাকে আশপাশের লোকজন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় ইতিমধ্যে পুলিশ ৫ জনকে আসামি করে আদালতে চার্জশিট দিয়েছে। যার মধ্যে হত্যাকারী এক বন্ধুর পিতাকেও আসামি করা হয়েছে। বর্তমানে অভিযুক্তদের মধ্যে কারাগারে থাকা প্রধান আসামি ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী শাহ সেলিম টিপু এবং তার ছেলে জুনায়েদ আহমেদ রিয়াদের জামিন নামঞ্জুর করা হয়েছে। বাকিদের মধ্যে ড্যানি ও শাওন এখনও পলাতক। হিমু শহরের সামারফিল্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজের 'এ' লেভেলের ছাত্র ছিল। পরের ঘটনাটি আরও ভয়ঙ্কর। ঈদের পর পাহাড়ি এক স্কুলছাত্রীকে ফুসলিয়ে নিয়ে যায় তারই সহপাঠী পিয়াস চাকমা। উদ্দেশ্য- মেয়েটিকে ধর্ষণ করবে। আর এই কাজে তাকে সহায়তা করবে আরও ৪ বন্ধু। পিয়াসের বখাটে বন্ধুদের সঙ্গে এই নিয়ে বিকৃত 'বাজি' ধরা হয়। এসব বন্ধুর সঙ্গে শর্ত হয় সে মেয়েটির সর্বনাশ করবে। তারা দূর থেকে তা দেখবে। ঘটনার আগে পিয়াস ১০ম শ্রেণী পড়ুয়া সহপাঠী মেয়েটির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় নগরীর বায়েজিদ এলাকার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের পেছনে একটি নির্জন পাহাড়ে নিয়ে যায়। এরপর সেখানে মেয়েটিকে নিয়ে পৌঁছানোর পরপরই তার বখাটে বন্ধুরা জোর করে মেয়েটিকে বস্ত্রহরণ করে। ঠিক সিনেমার ভয়ঙ্কর কোন দৃশ্য। যৌন নির্যাতনের আগে গোল হয়ে সবাই মিলে ইয়াবা ট্যাবলেট সেবন করে। বর্তমানে মেয়েটি একপ্রকার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। সে কারও সঙ্গে কোন কথা বলছে না। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গোয়েন্দা পুলিশ ধর্ষক পিয়াস চাকমা, তার বন্ধু আহমেদ ফজল শাওন (১৬), ফাহাদ উদ্দিন পিউল (১৬) ও খালেদ শামস (১৭) নামের ৪ স্কুলছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে। তারা সবাই নাসিরাবাদ বালক উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র। খুলশী থানার ওসি আবদুল লতিফ তাদের গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এর আগের দুর্ধর্ষ একটি চুরির ঘটনায় যাদের ধরা হয়েছে তারাও স্কুল কলেজের একদল ছাত্র। ১৭ই ফেব্রুয়ারি নগরীর দেবপাহাড় এলাকায় অভিজাত একটি ফ্ল্যাটে চুরি হয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, স্বচ্ছল পরিবারের ছয় স্কুলছাত্র এই ঘটনায় ধরা পড়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানায়, সিনেমার কোন ছবির মতো তারা ডুপ্লিকেট মাস্টার চাবি তৈরি করে। পরে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের দরজা খুলে চুরি করে সটকে পড়তো। একসময় সবাই চুরিতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফিরে আসার চেষ্টা করলেও টাকা-পয়সা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। এভাবেই নগরীর পূর্ব নাসিরাবাদ শান্তি ধারা আবাসিক এলাকার একটি গ্যারেজ থেকে প্রাইভেটকার উধাও করে দেয় আরেক দল স্কুলছাত্র।

তবে কেবল খুন, ধর্ষণ অথবা চুরি নয়। ধারালো অস্ত্রের দিকেও ধাবিত হয়েছে অভিযুক্ত অনেক কিশোর। নগর পুলিশের এক কর্মকর্তা জানান, অপরাধে জড়িয়ে পড়া একাধিক কিশোর জিজ্ঞাসাবাদে তাদের যেসব অস্ত্রের কথা জানিয়েছে তাতে তারা নিজেরাও হতবাক। ইন্টারনেটে অনেকে সিনেমায় পিস্তল কিংবা গুলির নাম অভিনেতাদের মুখে শুনে শুনে সব তাদের মুখস্থ।

Dhaka University Institutional Repository

৬.২ সামাজিকীকরণের সমস্যায় অপরাধে জড়াচ্ছে কিশোর কিশোরীরাঃ

খুনোখুনি কোনো নতুন ঘটনা নয়। প্রতিদিন দেশে খুন হয় গড়ে এগারো জন। এর ভিড়ে শুক্রবার রাতে ঢাকায় নিজ ফ্ল্যাটে পুলিশ কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান এবং তার স্ত্রী স্বপ্না রহমানের মৃত্যু নাড়া দিয়েছে গোটা দেশকে। পুলিশের ধারণা, এই খুনের পরিকল্পনাকারী এই দম্পতিরই ষোলো বছরের মেয়ে ঐশী রহমান। ঐশী মাদকাসক্ত বলেও জানিয়েছে পুলিশ। এই বয়সে বিপথে যাওয়ার জন্য এই মাদককেই দায়ী করছে পুলিশ। কিন্তু হেসে খেলে বাড়ি মাতিয়ে রাখার বয়সে কেন খুনের মতো ঘটনায় জড়িয়েছে এই কিশোরী, তা ভেবে পাচ্ছে না আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীটি।এই ধরনের কিশোর অপরাধের ঘটনা এটাই প্রথম না। এর আগেও আলোচিত ঘটনায় জড়িয়েছে নিজপরিবারের সদস্য কিশোর-কিশোরীরা। কেন এমন হচ্ছে? দুইজন সমাজবিজ্ঞানী বলেছেন, কিশোর বয়স সব সময় বিপজ্জনক। এই সময়টাতে পরিবারকেই তাদের সদস্যদের আগলে রাখতে হবে।সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন, সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনে পরিবর্তন, যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবারের প্রবণতা সন্তানের সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলছে। স্বজনদের সঙ্গে সময় কাটানোর বদলে শিশু-কিশোররা টেলিভিশন, ইন্টারনেটে সময় কাটাচ্ছে বেশি। আর এতে ছোটো বয়সের জন্য ক্ষতিকর বিভিন্ন উপাদানের প্রতি তৈরি হচ্ছে আসক্তি।আবার বাবা-মাও সব সময় সন্তানকে ঠিকমতো দেখাশোনা করেন এমনটা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই কর্মজীবী বাবা এবং মা তার সন্তানের স্নেহের চাহিদা পূরণ করতে পারেন না বাস্তব কারণেই। এসব সন্তানের বেড়ে উঠায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিতে কিশোর-কিশোরীদের ঠিকমতো দেখভাল না হলে তার মানুষ হিসেবে গড়ে উঠায় ফেলে নেতিবাচক প্রভাব।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক রাশেদা ইরশাদ নাসির বলেন, প্রায় ক্ষেত্রেই বাবা-মায়ের সঙ্গে সন্তানদের দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার কারণে মূল্যবোধের যে ঘাটতি হচ্ছে, তা কেউ খেয়াল করছে না। সামাজিক বিধি-বন্ধন থাকছে না। ফলে সমাজ ব্যবস্থায় অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে। বিপথগামী হয়ে পড়ছে সন্তানরা। সামাজিকীকরণ ও সাংস্কৃতিকীকরণের এই সমস্যা থেকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা তৈরি হতে পারে বলে মনে করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সমাজবিজ্ঞানী এ এস এম আমানুল্লাহ। তিনি বলেন, 'সামাজিকীকরণ ও সাংস্কৃতিকীকরণের সমস্যা থেকেই সমাজে নানা অসঙ্গতি দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের কর্তব্য বড় হয়ে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে বাবা-মা অনৈতিকতায় জড়িত থাকার কারণে সন্তানদের নৈতিকতা শেখানোর সুযোগ পান না। এ ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশ্বায়নের ধাক্কায় পারিবারিক বন্ধন ভেঙে যাচ্ছে। আয়েসী জীবনের প্রতি ঝুঁকে যাচ্ছে সন্তানরা। ফলে ভালোমন্দ বুঝে উঠার আগেই অনৈতিক কর্মকান্ড করে ফেলছে। এই অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিশোর বয়সের জন্য ক্ষতিকর জানিয়ে বাবা-মাকেই সন্তানকে বোঝানোর পরামর্শ দিয়েছেন সমাজ বিজ্ঞানী রাশেদা ইরশাদ নাসির। দৈনন্দিন জীবন-যাপনে তীব্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা সন্তানদের সামাজিক আনুগত্যবোধকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ফলে তরুণ প্রজন্ম মা-বাবা হত্যার ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা হচ্ছে না।' অবশ্য আরেক সমাজবিজ্ঞানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাদেকা হালিম মনে করেন, কিশোর বয়সে মাদকের হাতছানি বড়ই বিপজ্জনক। এর কারণেই জীবনের এই সময়টাতে অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে মানুষ। তিনি বলেন, সন্তানরা অল্প বয়সে মাদকাসক্ত হচ্ছে অন্যদের দ্বারা। যারা মাদক ছড়াচ্ছে তাদের মূলে আঘাত করতে হবে, তা না হলে সমাজ ভেঙে পড়বে। কিশোরদের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ স্বজনদের সঙ্গে সরাসরি মেলামেশা বাড়ানো, তাদের সমস্যা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা, ভুলগুলো শুধরে নেয়ার চেষ্টা এবং নিয়মিত কাউন্সেলিংয়ের পরামর্শ দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

গবেষণার ফলাফল

সপ্তম অধ্যায়

গবেষণার ফলাফল

আমার গবেষণার শিরোনাম বাংলাদেশ কিশোর অপরাধ পরিস্থিতিঃ মুন্সীগঞ্জ শহরের উপর একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন। এই গবেষণা পরিচালনা করতে গিয়ে মুন্সীগঞ্জ শহর, সদর থানা,জেলাখানা ও কিশোর-কিশোরীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি, তাদের কাছ থেকে প্রশ্ন-পত্র ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছি। তথ্য সংগ্রহের পর ফলাফল বিশ্লেষণের জন্য ৫১ টি প্রশ্নের মধ্যে ২৯ টি প্রধান প্রশ্ন নির্বাচন করেছি এবং সেগুলোর উপর ভিত্তি করে ২৯টি সারণী তৈরি করে দন্ড চিত্র উপস্থাপন করেছি।

সারণী-১

উত্তরদাতাদের বয়সের সারণীর শতকরা বিন্যাস :

বয়স	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
৭-৯	১২	১০.০০%
১০-১২	৪৮	৪০.০%
১৩-১৫	৩২	২৬.৬৭ %
১৬-১৭	২৮	২৩.৩৪%
মোট	১২০	১০০%

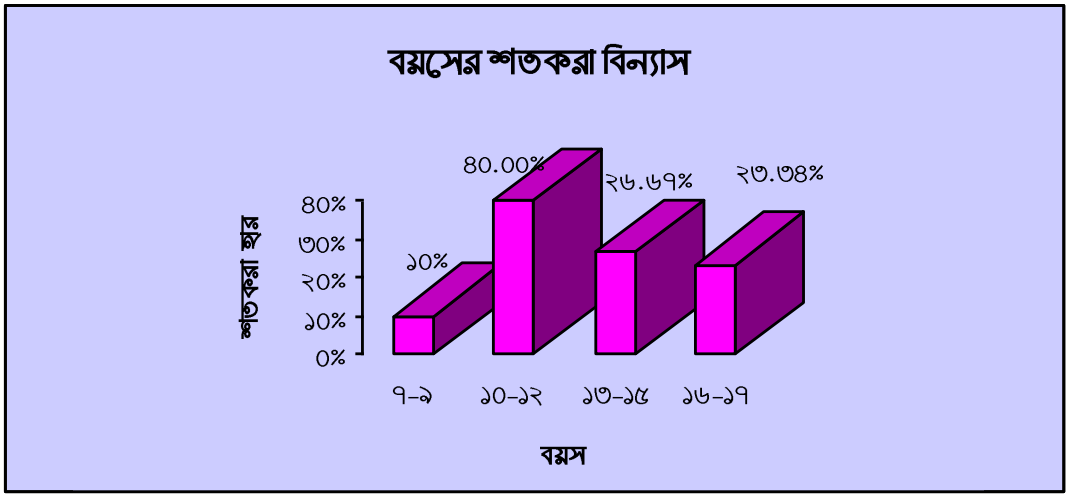

বয়স ভিত্তিক লেখ

১ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিশোর অপরাধীদের বয়সগত পার্থক্য রয়েছে। এদের মধ্যে ৭ থেকে ৯ বছরের ১০%, ১০ থেকে ১২ বছরের ৪০%, ১৩ থেকে ১৫ বছরের ২৬-৬৭ % এবং ১৬ থেকে ১৭ বছরের ২৩.৩৪% অপরাধের সাথে যুক্ত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কিশোর অপরাধীদের মধ্যে ১০ বছর বয়সীদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী।

সারণী-২

উত্তরদাতাদের লিঙ্গ ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

লিঙ্গ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ছেলে	১১২	৯৩.৩৩%
মেয়ে	৮	৬.৬৭%
অন্যান্য	০	০%
মোট	১২০	১০০%

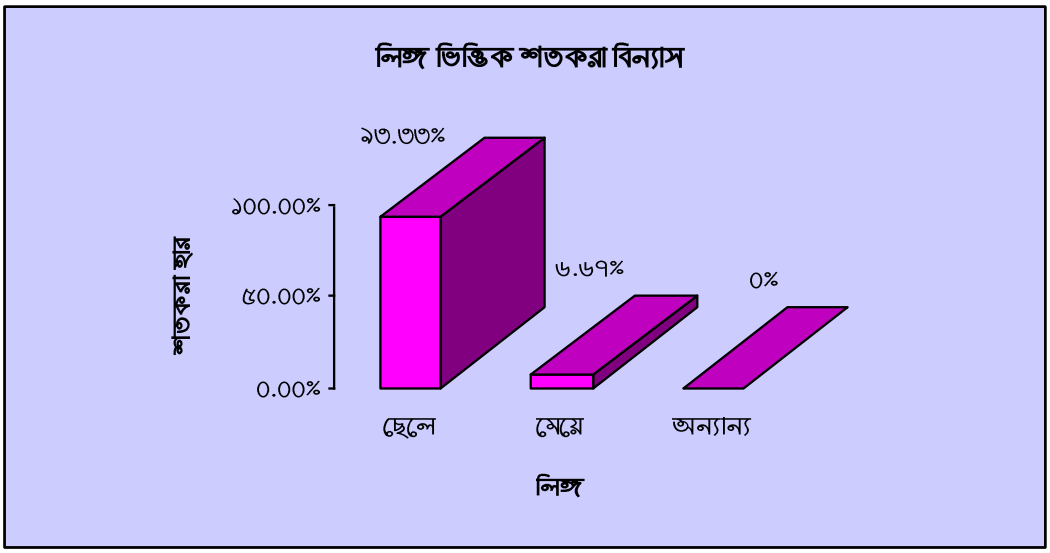

লিঙ্গ ভিত্তিক লেখ

২ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিশোর অপরাধীদের মধ্যে লিঙ্গগত পার্থক্য রয়েছে। ছেলে কিশোর অপরাধী ৯৩.৩৩%, মেয়ে ৬.৬৭ % এবং অন্যান্য ০% । এতে প্রতীয়মান হয় যে কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের সংখ্যা অনেক বেশী।

সারণী-৩ :

উত্তরদাতাদের জন্মস্থান ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

জন্মস্থান	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
জন্মগতভাবে মুন্সীগঞ্জে বসবাসরত	৬৪	৫৩.৩৩%
স্থানান্তরের কারণে মুন্সীগঞ্জে বসবাসরত	৫৬	৪৬.৬৭%
মোট	১২০	১০০%

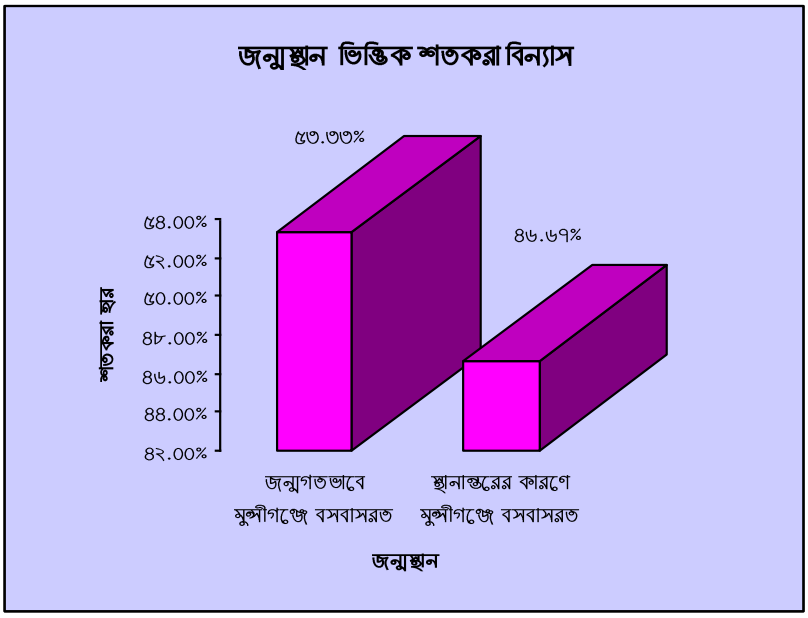

জন্মস্থান ভিত্তিক লেখ

৩ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ১২০ জন উত্তর দাতার মধ্যে ৬৪ জন জন্মগতভাবে মুন্সীগঞ্জে বসবাসরত বাকী ৫৬ জন স্থানান্তরের কারণে মুন্সীগঞ্জে বসবাস করছে ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪ :

উত্তরদাতাদের স্থানান্তরের কারন ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

আসার কারন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
প্রকট দারিদ্র্য	২৯	৫১.৭৯%
প্রাকৃতিক দূর্যোগ	২৬	৪৬.৪৩%
গ্রামীন দ্বন্দ্ব	১	১.৭৯%
পিতা-মাতার তালাক	০	০%
পারিবারিক নিরাপত্তাহীনতা	০	০%
সঙ্গদোষ	০	০%
অপরাধ	০	০%
পলাতক	০	০%
ঘৃণা	০	০%
মোট	৫৬	১০০%

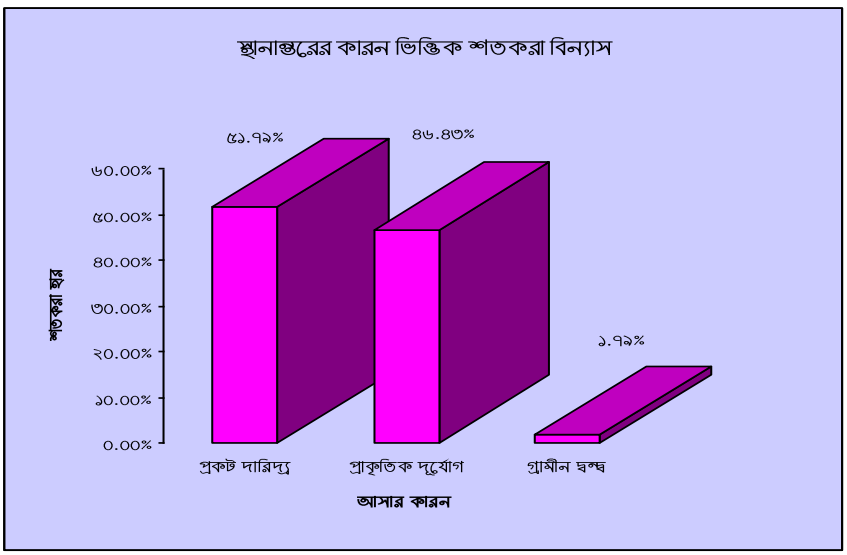

স্থানান্তরের কারণ ভিত্তিক লেখ

৪ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ৫১.৭৯% স্থানান্তরের কারণে, ৪৬.৪৩% প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে, ১.৭৯% । সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে প্রকট দারিদ্র্য ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে প্রায় ৯৮ % কিশোর অপরাধীরা স্থানান্তরের মাধ্যমে মুন্সীগঞ্জে এসেছে ।

সারণী-৫ :

উত্তরদাতাদের পরিবার প্রধানের পেশা ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

পরিবারের প্রধানের পেশা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
চাকুরী	৪	৩.৩৩%
ব্যবসা	২০	১৬.৬৭%
ডাক্তার	০	০০%
শিক্ষকতা	০	০০%
অন্যান্য	৯৬	৮০.০০%
মোট	১২০	১০০%

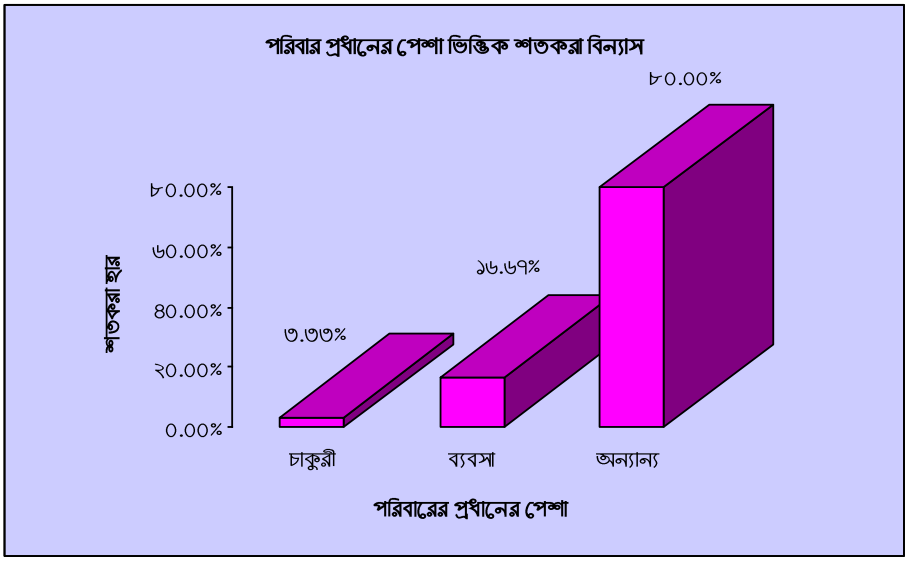

পরিবার প্রধানের পেশা ভিত্তিক লেখ

৫ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীর পরিবারের প্রধানের ৩.৩৩% চাকুরী, ১৬.৬৭% ব্যবসা, এবং ৮০% অন্যান্য পেশায় জড়িত ।

সারণী -৬

উত্তরদাতাদের অভিভাবকের মাসিক আয় ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

বাবার মাসিক আয়	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
৫০০০-৬০০০	৪৩	৩৫.৮৪%
৬০০০-৭০০০	৩৪	২৮.৩৩%
৭০০০-৮০০০	১১	৯.১৭%
৮০০০-৯০০০	১০	৮.৩৩%
৯০০০-১০০০০	৯	৭.৫০%
১০০০০-১২০০০	১৩	১০.৮৩%
মোট	১২০	১০০%

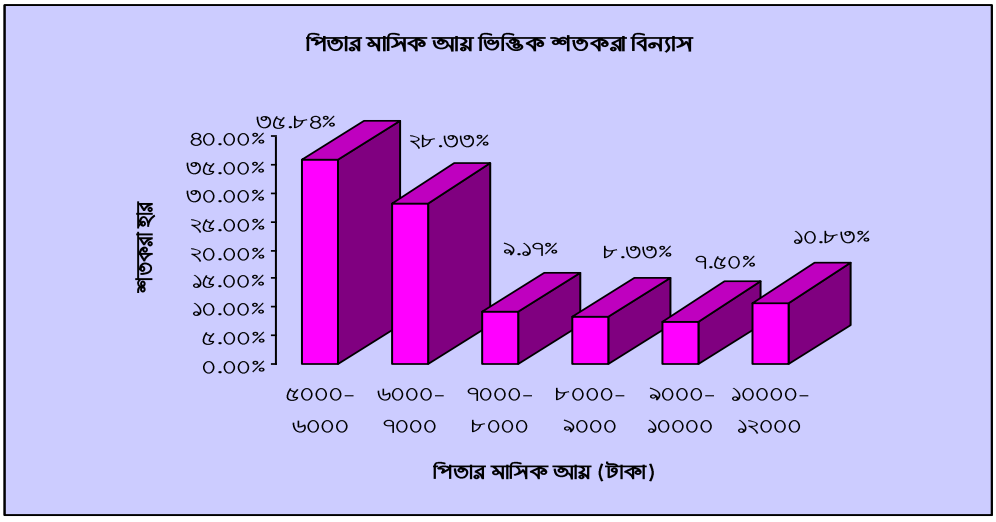

পিতার মাসিক আয় ভিত্তিক লেখ

৬ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীর পিতার মাসিক আয় ৫০০০-৬০০০ টাকার মধ্যে ৩৫.৮৪%, ৬০০০-৭০০০ টাকার মধ্যে ২৮.৩৩%, ৭০০০-৮০০০ টাকার মধ্যে ৯.১৭%, ৮০০০-৯০০০ টাকার মধ্যে ৮.৩৩%, ৯০০০-১০০০০ টাকার মধ্যে ৭.৫০%, ১০০০০-১২০০০ টাকার মধ্যে ১০.৮৩% । সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের বেশী অংশের পিতার মাসিক আয় ৫ হাজার থেকে ৬ হাজার টাকার মধ্যে ।

সারণী -৭

উত্তরদাতাদের পারিবারিক তথ্য ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

পরিবারে সদস্য সংখ্যা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
১	১২	১০.০%
২	২০	১৬.৬৭%
৩	৩০	২৫.০%
৪	১৬	১৩.৩৩%
৫	২০	১৬.৬৭%
৬	২২	১৮.৩৩%
মোট	১২০	১০০%

৭ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিশোর অপরাধীদের পরিবারের সংখ্যাগত পার্থক্য বিদ্যমান। এদের মধ্যে ১ সদস্যের ১০.০%, ২ সদস্যের ১৬.৬৭%,৩ সদস্যের ২৫.০%, ৪ সদস্যের ১৩.১৩%, ৫ সদস্যের ১৬.৬৭%, ৬ সদস্যের ১৮.৩৩% ।

সারণী -৮

উত্তরদাতাদের পারিবারের ধরণ ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

পরিবারের ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
একক	৮৪	৭০%
যৌথ	৩৬	৩০%
মোট	১২০	১০০%

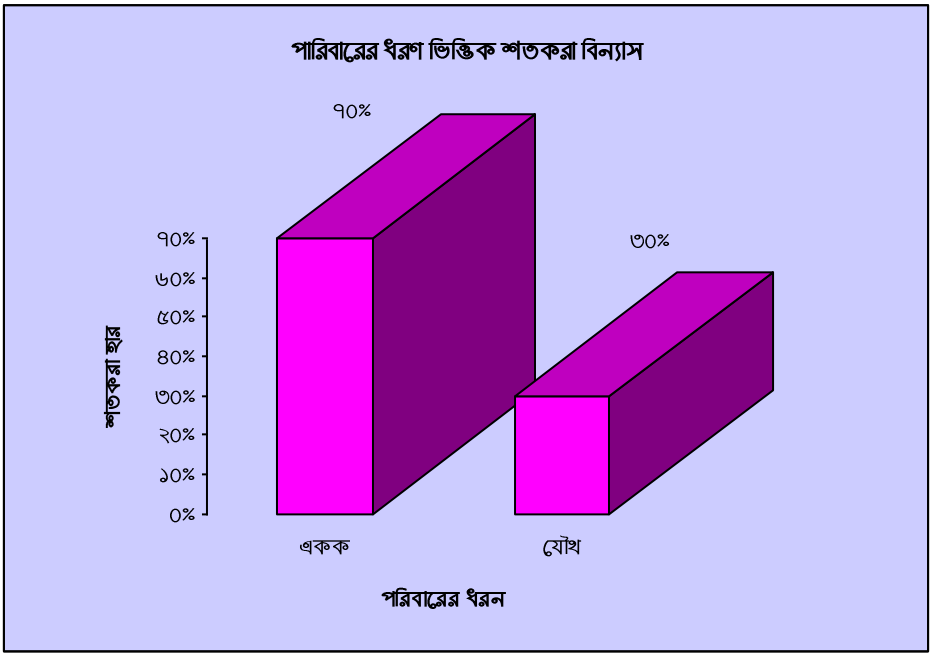

পারিবারের ধরণ ভিত্তিক লেখ

৮ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীর পরিবারের ধরনগত পার্থক্য রয়েছে। এর মধ্যে ৭০% কিশোর অপরাধী একক পরিবারে এবং বাকী ৩০% কিশোর অপরাধী যৌথ পরিবারে বসবাস করে। সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে উত্তরদাতাদের মধ্যে একক পরিবারের সংখ্যাই বেশী।

সারণী -৯

উত্তরদাতাদের নিজ বাসস্থান ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

নিজ বাড়িতে থাকা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৪	১১.৬৭%
না	১০৬	৮৮.৩৩%
মোট	১২০	১০০%

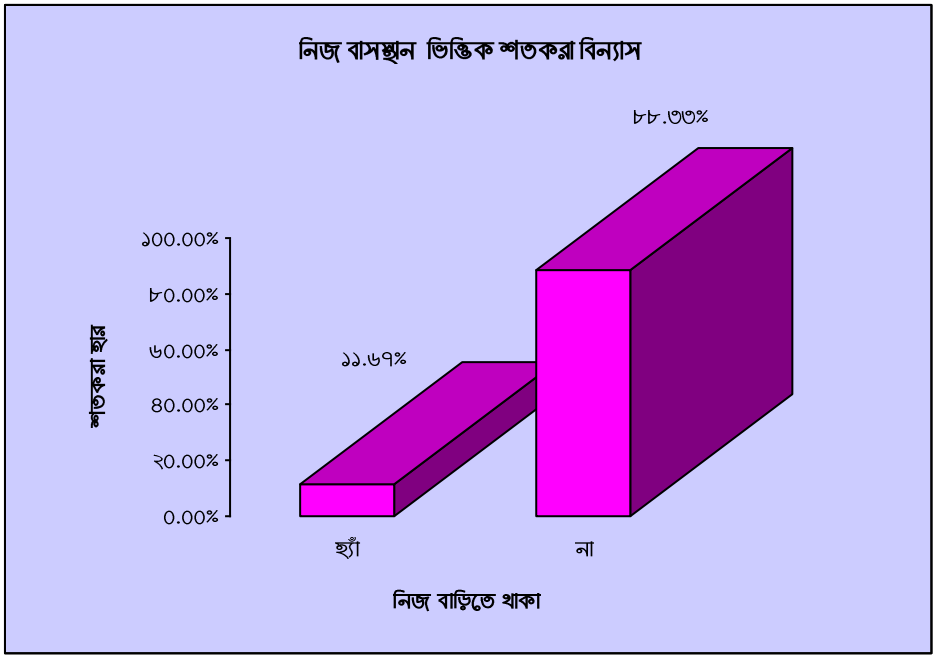

সারণী -৯: নিজ বাসস্থান ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস

৯ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের ১১.৬৭ % নিজ বাড়িতে থাকেন। বাকী ৮৮.৩৩% কিশোর অপরাধী নিজ বাড়িতে থাকেন না।

সারণী -১০

উত্তরদাতাদের বাসস্থানের ধরন ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

বাসস্থানের ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
কাচা	৮৬	৭১.৬৭%
পাকা	১২	১০.০%
আধা পাকা	২২	১৮.৩৩%
মোট	১২০	১০০%

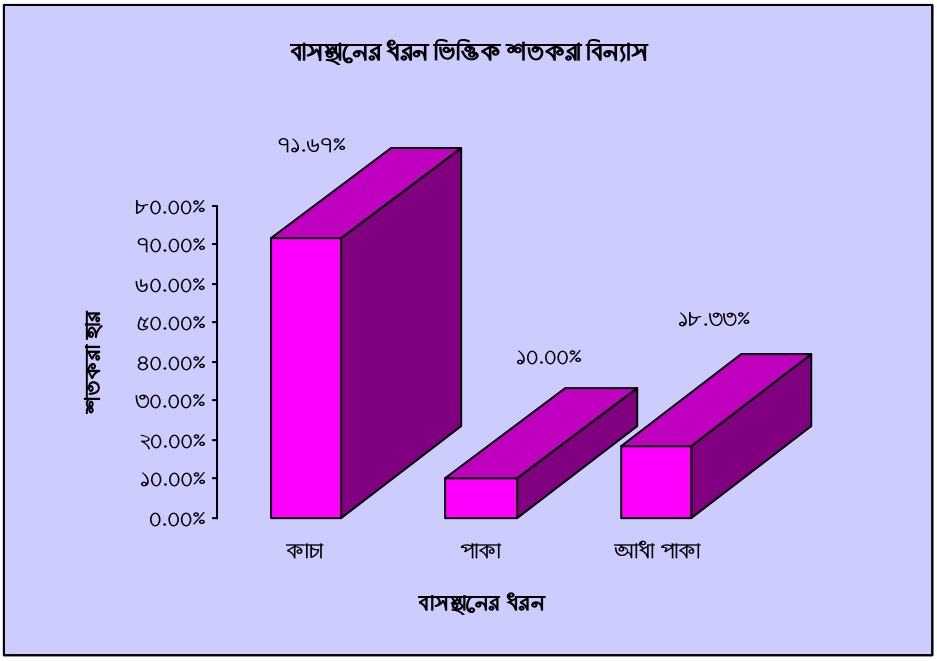

বাসস্থানের ধরন ভিত্তিক লেখ

১০ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের বাসস্থানের ধরনগত পার্থক্য রয়েছে। এদের মধ্যে ৭১.৬৭% কাঁচা, ১০.০% পাকা, ১৮.৩৩% আধা পাকা বাসস্থানে বসবাস করে।

সারণী -১১

উত্তরদাতাদের বিদ্যুৎ ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

বিদ্যুৎ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১০৮	৯০.০%
না	১২	১০.০%
মোট	১২০	১০০%

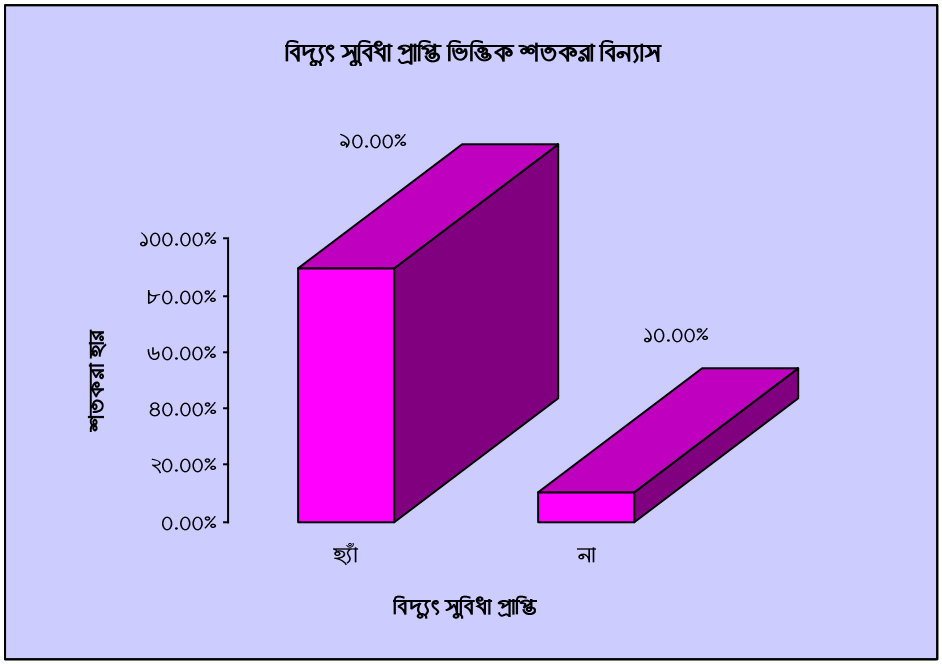

বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্তি ভিত্তিক লেখ

১১ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে ১০৮ জন বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। বাকী ১২ জন বিদ্যুত ব্যবহার করে না। সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে উত্তরদাতাদের বেশীর ভাগই বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত।

সারণী -১২

উত্তরদাতাদের টিউবওয়েলের পানি ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

টিউবওয়েলের পানি ব্যাবহার	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৯০	৭৫.০%
না	৩০	২৫.০%
মোট	১২০	১০০%

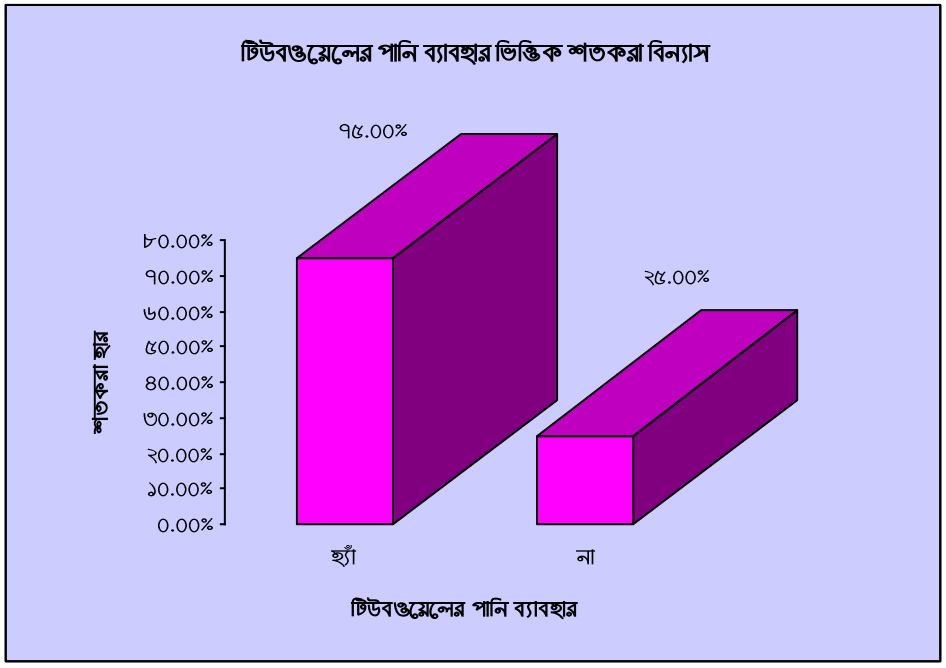

টিউবওয়েলের পানি ব্যাবহার ভিত্তিক লেখ

১২উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে ৭৫% টিউবওয়েলের পানি ব্যাবহার করেন। বাকী ২৫% টিউবওয়েলের পানি ব্যাবহার করেন না।

সারণী -১৩

উত্তরদাতাদের বিনোদনের ব্যবস্থা সংক্রান্ত সারণীর শতকরা বিন্যাস :

বিনোদনের ব্যবস্থা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৬৬	৫৫%
না	৫৪	৪৫%
মোট	১২০	১০০%

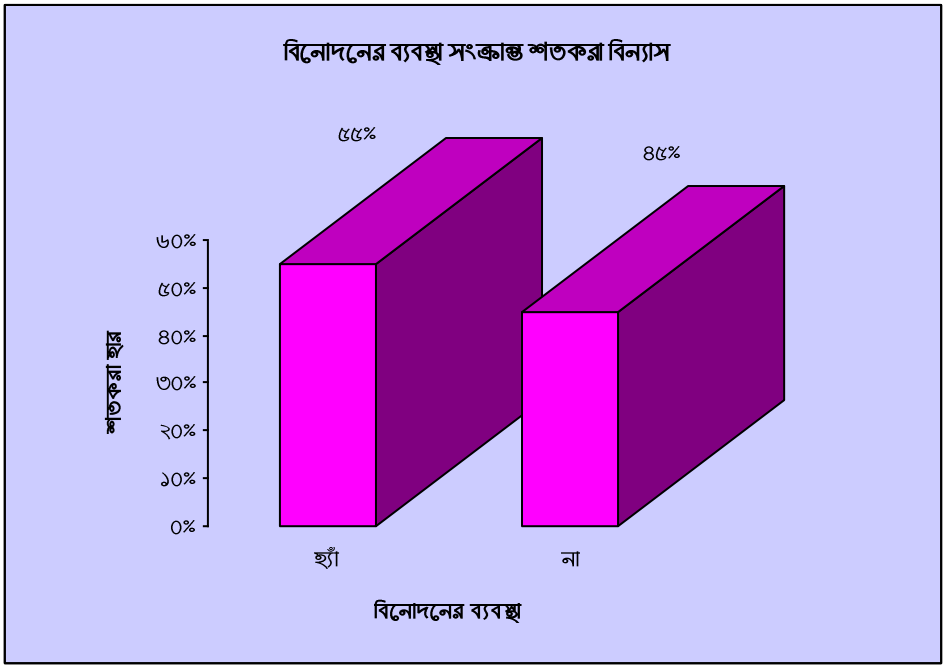

বিনোদনের ব্যবস্থা সংক্রান্ত লেখ

১৩ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে ৫৫% বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে ।বাকী ৪৫% বিনোদনের ব্যবস্থা নেই ।

সারণী -১৪

উত্তরদাতাদের অপরাধ ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

অপরাধের সাথে যুক্ত	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৮০	৬৬.৬৭%
না	৪০	৩৩.৩৩%
মোট	১২০	১০০%

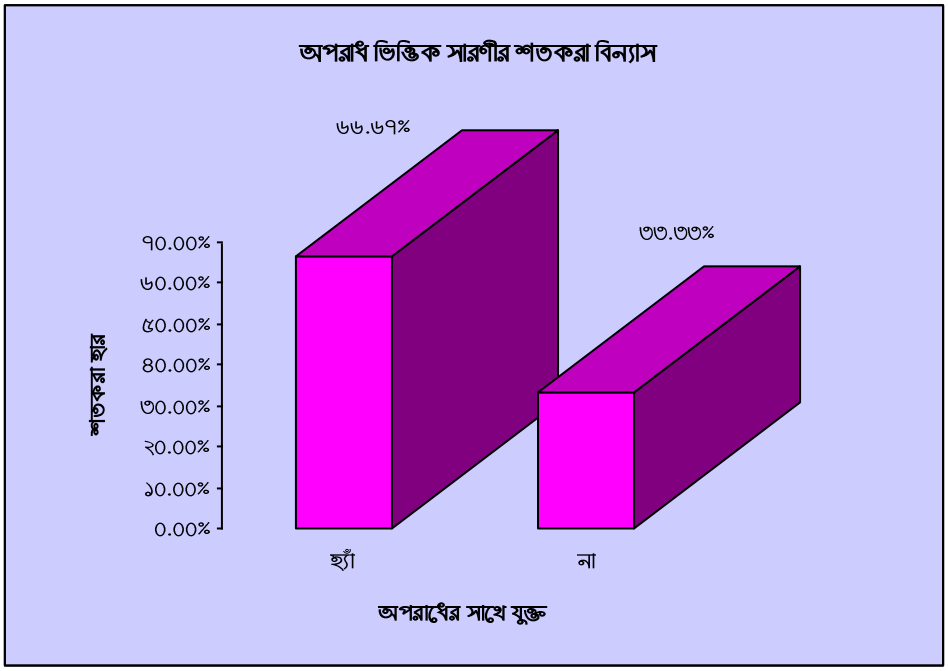

অপরাধ ভিত্তিক লেখ

১৪ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে ৮০ জন অপরাধের সাথে যুক্ত বলে স্বীকার করেছেন। বাকী ৪০ জন অপরাধের সাথে যুক্ত নয় বলে জানান। সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে বেশীর ভাগ উত্তরদাতাই স্বীকার করেছে যে তারা কিশোর অপরাধের সাথে যুক্ত। তবে আবার অনেকেই অপরাধের সাথে যুক্ত থাকার বিষয়টি এড়িয়ে গেছে।

সারণী -১৫

উত্তরদাতাদের অপরাধের ধরণ ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

অপরাধের সাথে যুক্ত	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
চুরি	৫২	৬৫.০%
টোকাই	১৪	১৭.৫%
পকেটমার	৬	৭.৫%
ছিনতাই	৮	১০.০%
মোট	৮০	১০০%

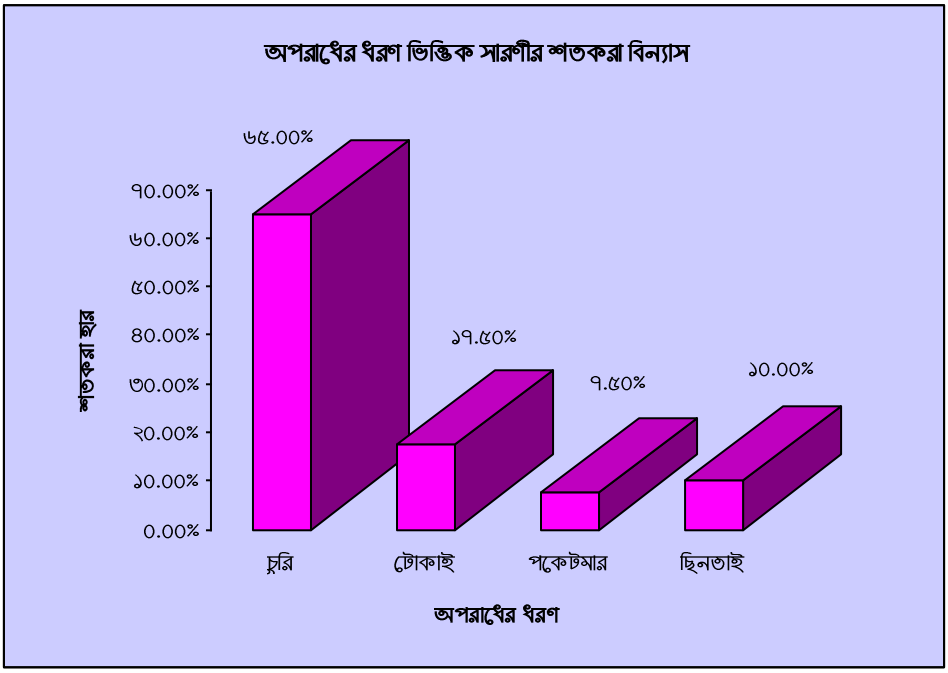

অপরাধের ধরণ ভিত্তিক লেখ

১৫ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে ৬৫% চুরি, ১৭.৫% টোকাই,৭.৫% পকেটমার,১০.০%ছিনতাইয়ের সাথে জড়িত। সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে কিশোর অপরাধের সাথে যুক্ত উত্তরদাতাদের মধ্যে চুরির সাথে যুক্ত থাকার সংখ্যাই বেশী।

সারণী -১৬

উত্তরদাতাদের অপরাধের সাঁজা ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৫	১৩.৫০%
না	১০৫	৮৭.৫০%
মোট	১২০	১০০%

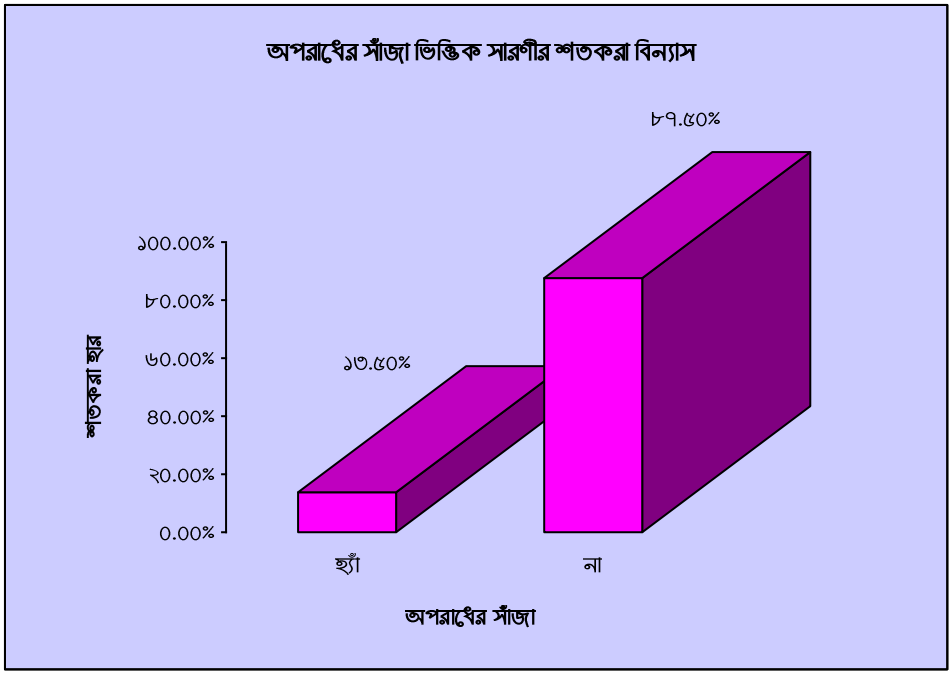

অপরাধের সাঁজা ভিত্তিক লেখ

১৬ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে ১৩.৫০% অপরাধের কারনে সাঁজা পেয়েছেন, ৮৭.৫০% অপরাধের কারনে সাঁজা পায়নি । সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে কিশোর অপরাধের সাথে যুক্ত উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮৭.৫০% সাঁজা পায়নি বলে মতামত দেন ।

সারণী -১৭

উত্তরদাতাদের সাঁজার সময় ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

সাঁজার সময়	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
বছর	০	০%
মাস	১৫	১০০%
মোট	১৫	১০০%

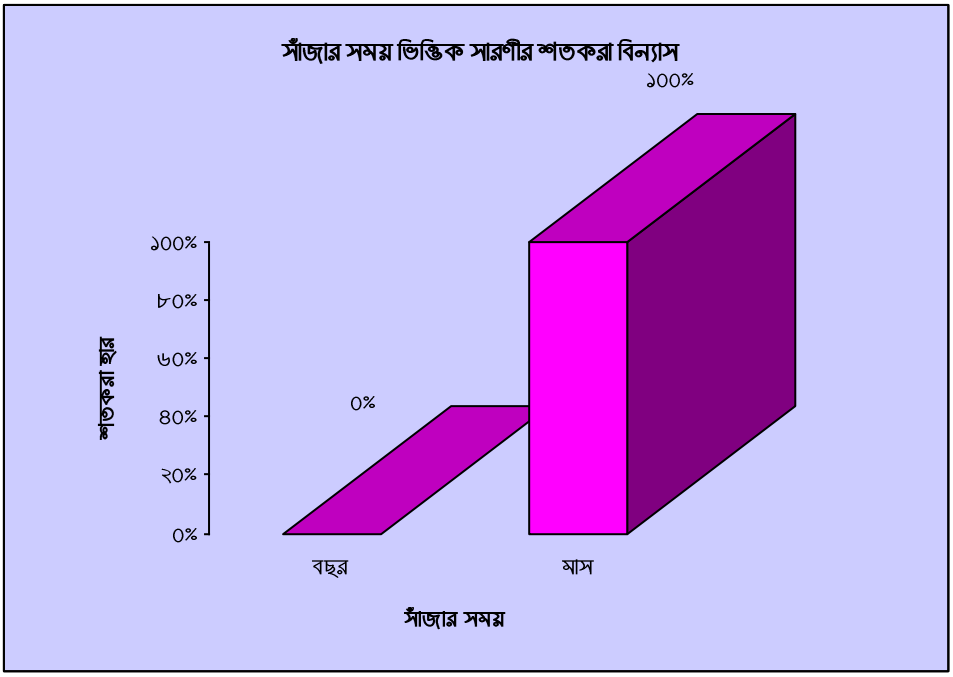

সাঁজার সময় ভিত্তিক লেখ

১৭ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ১০০% ই মাসিক জেল খেটেছে। সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে কিশোর অপরাধের সাথে যুক্ত উত্তরদাতাদের সবাই স্বল্প সময় সাঁজা ভোগ করেছে।

সারণী -১৮

উত্তরদাতারা অন্যান্য অপরাধী সম্পর্কে জ্ঞাত তথ্য ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

অপরাধী সম্পর্কে তথ্য	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৮২	৬৮.৩৩%
না	৩৮	৩১.৬৭%
মোট	১২০	১০০%

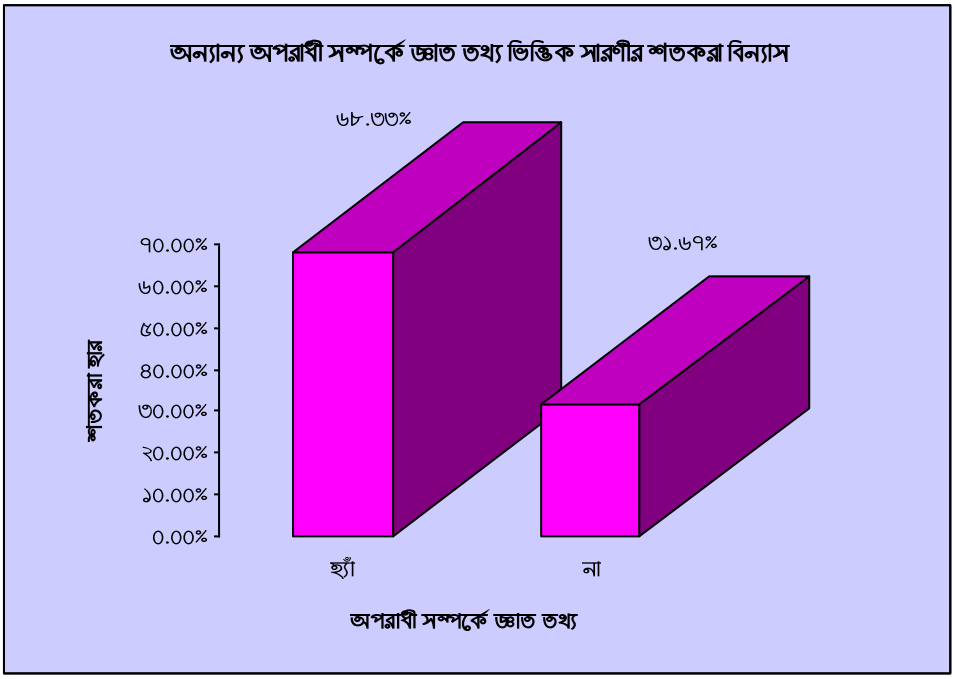

অন্যান্য অপরাধী সম্পর্কে জ্ঞাত তথ্য ভিত্তিক লেখ

১৮নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে ৮২ জন অপরাধী সম্পর্কে জানেন। বাকী ৩১ জন কোন অপরাধী সম্পর্কে জানেন না বলে মত দেন। সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮২ জন অন্যান্য অপরাধীকে চেনেন জানেন বলে মতাতম দেন। বাকী ৩৮ জন অন্যান্য অপরাধীর সঙ্গে পরিচয় নেই বলে জানান।

সারণী -১৯

উত্তরদাতাদের রাজনৈতিক নাশকতামূলক কাজ ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

রাজনৈতিক নাশকতামূলক কাজে অংশগ্রহন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৮২	৬৮.৩৩%
না	৩৮	৩১.৬৭%
মোট	১২০	১০০%

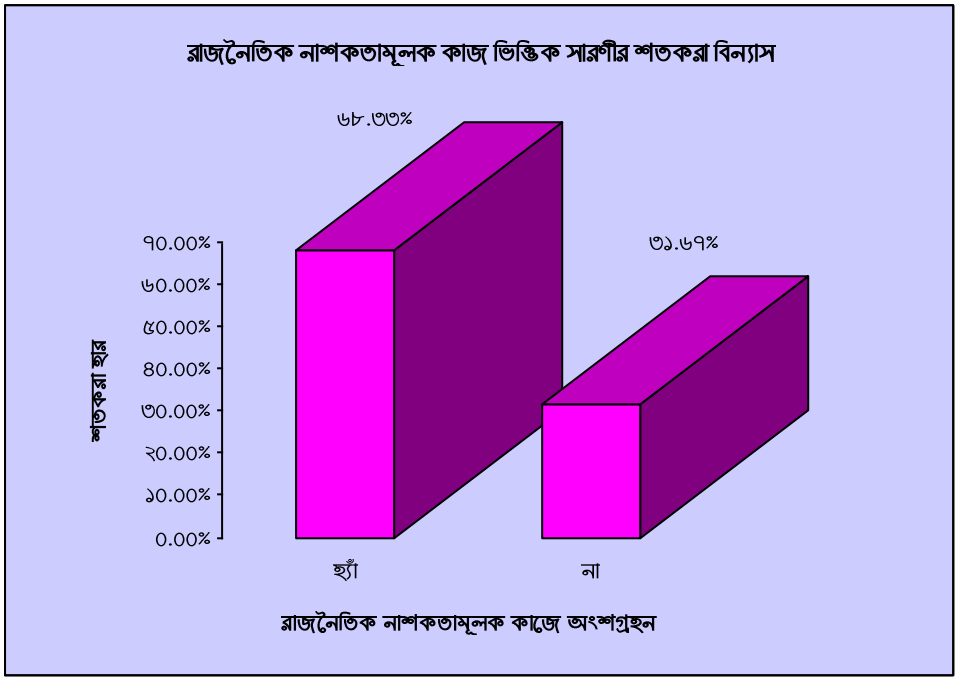

রাজনৈতিক নাশকতামূলক কাজ ভিত্তিক লেখ

১৯ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে ৮২ জন রাজনৈতিক নাশকতামূলক কাজে অংশগ্রহন করেন। বাকী ৩৮জন রাজনৈতিক নাশকতামূলক কাজে অংশগ্রহন করেন না। সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে অধিকাংশই রাজনৈতিক নাশকতামূলক কাজে অংশগ্রহন করেন।

সারণী -২০

উত্তরদাতাদের বন্ধুদের নেশা করা ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার	
হ্যাঁ	১০৬	৮৮.৩৩%
না	১৪	১১.৬৭%
মোট	১২০	১০০%

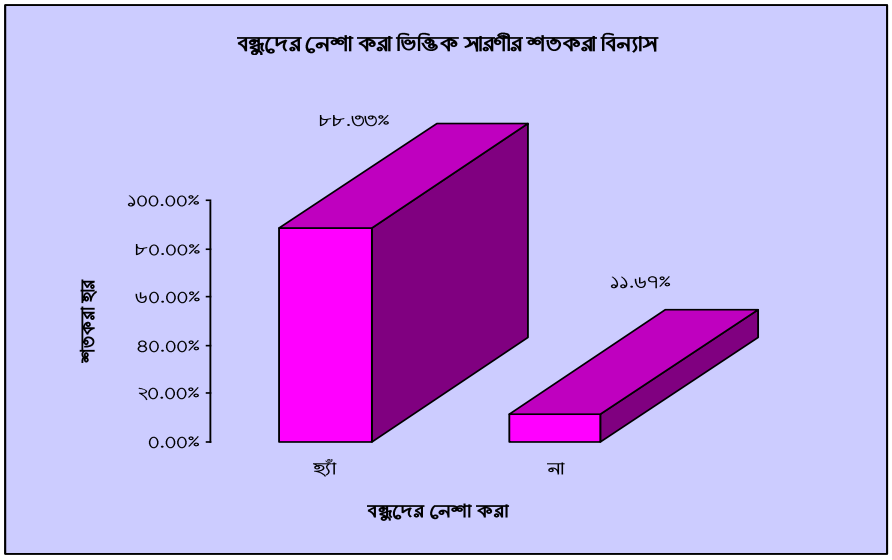

বন্ধুদের নেশা করা ভিত্তিক লেখ

২০ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে ৮৮.৩৩% নেশা করে, ১১.৬৭% নেশা করে না। সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে অধিকাংশর বন্ধুরাই নেশার সাথে জড়িত।

সারণী -২১

উত্তরদাতাদের বন্ধুদের নেশার ধরণ ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

নেশা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
গাজা	৪১	৩৪.১৭%
হেরোইন	৩	২.৫%
ফেনসিডিল	৪	৩.৩৩%
ইয়াবা	৩১	২৫.৮৩%
ধূমপান	৩৪	২৮.৩৩%
মদ	৩	২.৫%
অন্যান্য	৪	৩.৩৩%
মোট	১২০	১০০%

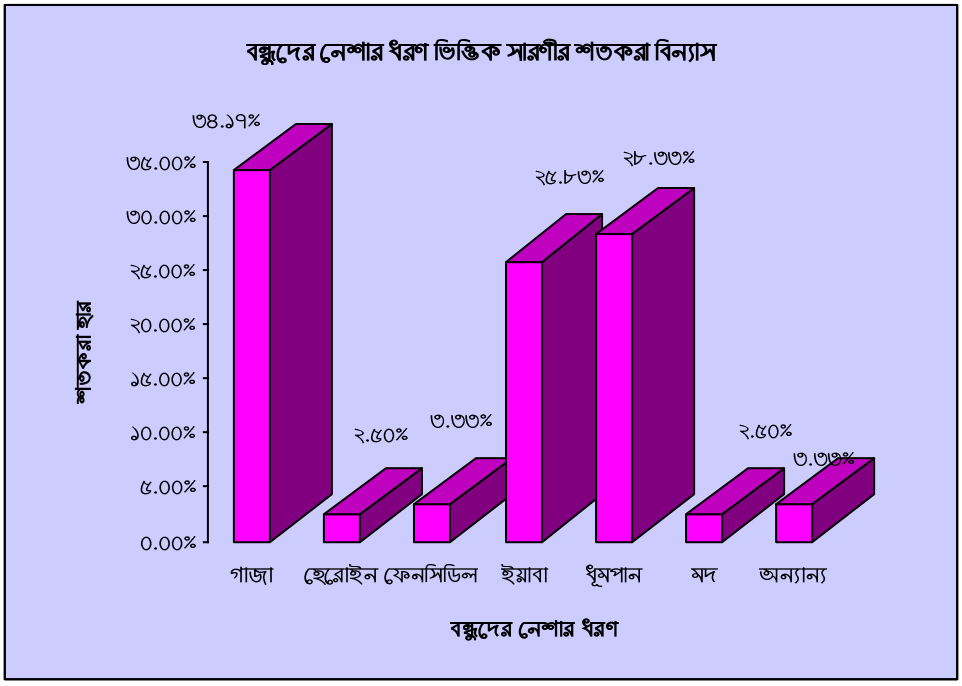

বন্ধুদের নেশার ধরণ ভিত্তিক লেখ

২১ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে ৩৪.১৭% গাজা,২.৫% হেরোইন,৩.৩৩% ফেনসিডিল,২৫.৮৩%ইয়াবা,২৮.৩৩%ধূমপান,২.৫% মদ ও ৩.৩৩% অন্যান্য নেশায় আসক্ত । সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে অধিকাংশই গাঁজায় আসক্ত ।

সারণী -২২

উত্তরদাতাদের নেশা করা ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার	
হ্যাঁ	১০৬	৮৮.৩৩%
না	১৪	১১.৬৭%
মোট	১২০	১০০%

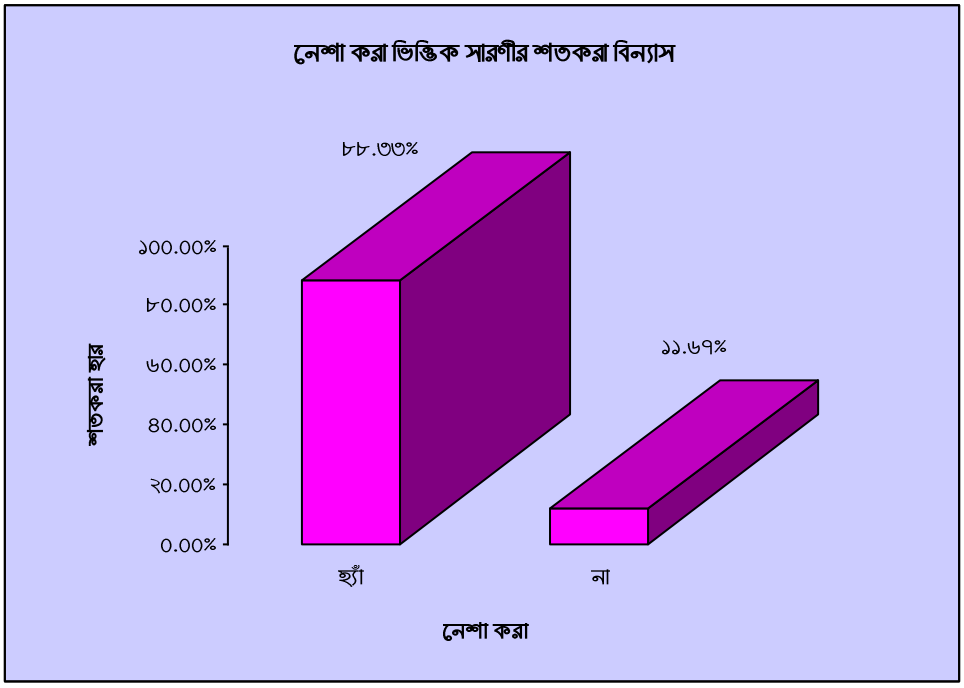

নেশা করা ভিত্তিক লেখ

২২ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে ৮৮.৩৩% নেশা করে, ১১.৬৭% নেশা করে না। সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে বেশীর ভাগই নেশার সাথে জড়িত। যা তাকে পরবর্তীতে অপরাধের সাথে যুক্ত করে ফেলে।

সারণী -২৩

উত্তরদাতাদের অপরাধ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

সমাজের লোকেরা অপরাধকে কিভাবে দেখে	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
খুব খারাপ দৃষ্টিতে	৬৬	৫৫%
মোটামুটি খারাপ দৃষ্টিতে	০	০%
খারাপ দৃষ্টিতে	৫৪	৪৫%
অন্যান্য	০	০%
মোট	১২০	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

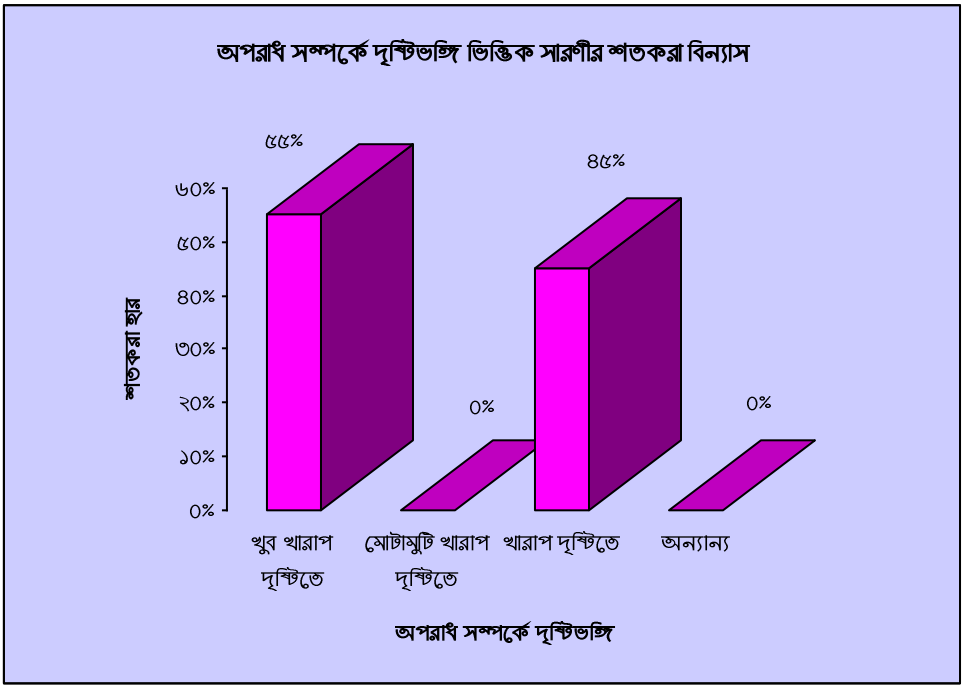

অপরাধ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ভিত্তিক লেখ

২৩ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে ৫৫% জনের অভিমত অপরাধীদের খুব খারাপ দৃষ্টিতে দেখে। ৪৫% -এর অভিমত অপরাধীদের খারাপ দৃষ্টিতে দেখে। সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে কিশোর অপরাধের সাথে যুক্ত উত্তরদাতাদের মধ্যে বেশীর ভাগই জানেন অপরাধীদের সম্পর্কে সমাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ভাল নয়। তারা সমাজের সকলের ঘৃনার পাত্র। তারপরও তারা অপরাধ করে।

সারণী -২৪

উত্তরদাতাদের অপরাধের কারণ সম্পর্কে মতামত ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

অপরাধের কারন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
দারিদ্র	৬৩	৫২.৫০%
বেকারত্ব	৩৫	২৯.১৭%
খারাপ সঙ্গ	১২	১০.০%
হতাশা গ্রস্থতা	৮	৬.৬৭%
অন্যান্য	২	১.৬৭%
মোট	১২০	১০০%

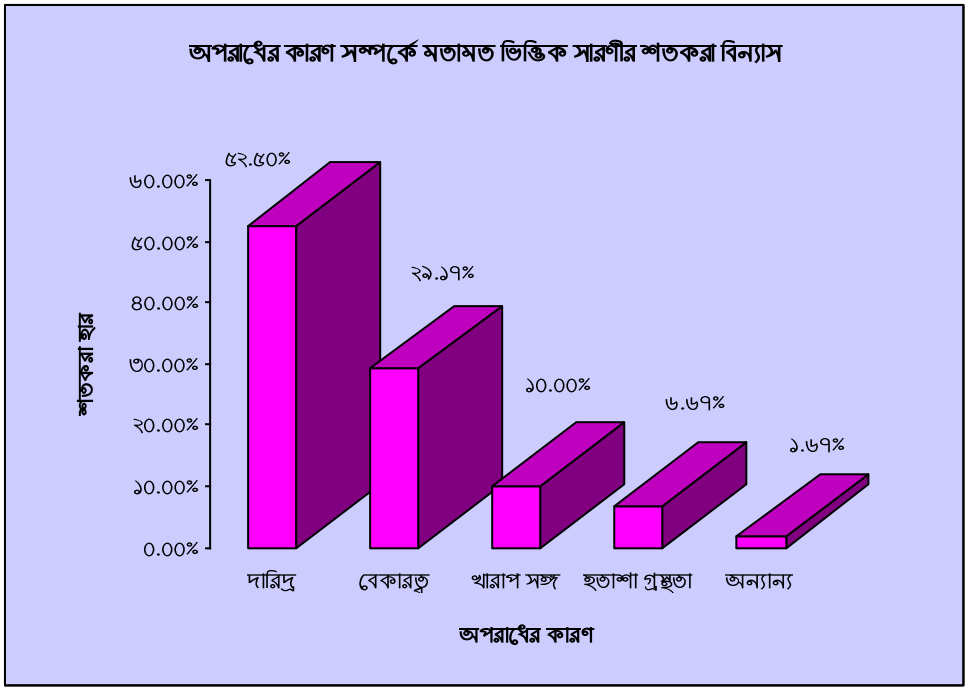

অপরাধের কারণ সম্পর্কে মতামত ভিত্তিক লেখ

২৪ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে ৫২.৫০% দারিদ্র্যের কারণে, ২৯.১৭% বেকারত্বের কারণে, ১০.০% খারাপ সঙ্গে, ৬.৬৭% হতাশা গ্রস্থতার কারণে এবং ১.৬৭% অন্যান্য কারণে। সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে কিশোর অপরাধের সাথে যুক্ত উত্তরদাতাদের মধ্যে দারিদ্র্যের কারণে অপরাধের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে।

সারণী -২৫

উত্তরদাতাদের বর্তমান পেশা ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

বর্তমানে কি করছেন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
লেখাপড়া	২৬	২১.৬৭%
কাজে নিযুক্ত	১৪	১১.৬৭%
বেকার	২৮	২৩.৩৩%
অন্যান্য	৫২	৪৩.৩৩%
মোট	১২০	১০০%

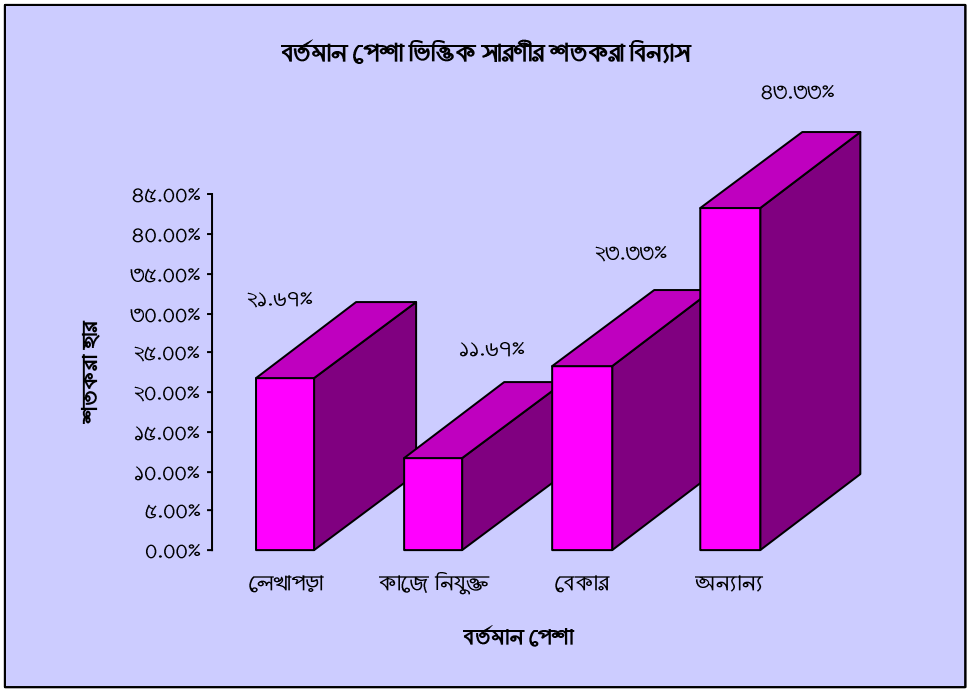

বর্তমান পেশা ভিত্তিক লেখ

২৫ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে ২১.৬৭% লেখাপড়া করেন,১১.৬৭% কাজে নিযুক্ত,২৩.৩৩% বেকার,৪৩.৩৩% অন্যান্য কাজে রয়েছে ।

সারণী -২৬

উত্তরদাতাদের অপরাধের কারণ ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

কিশোররা কেন অপরাধ করে	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
আর্থিক সুবিধার জন্য	৮৬	৭১.৬৭%
অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে	৩৪	২৮.৩৩%
ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দেখানোর জন্য	০	০%
শখ বশত	০	০%
মোট	১২০	১০০%

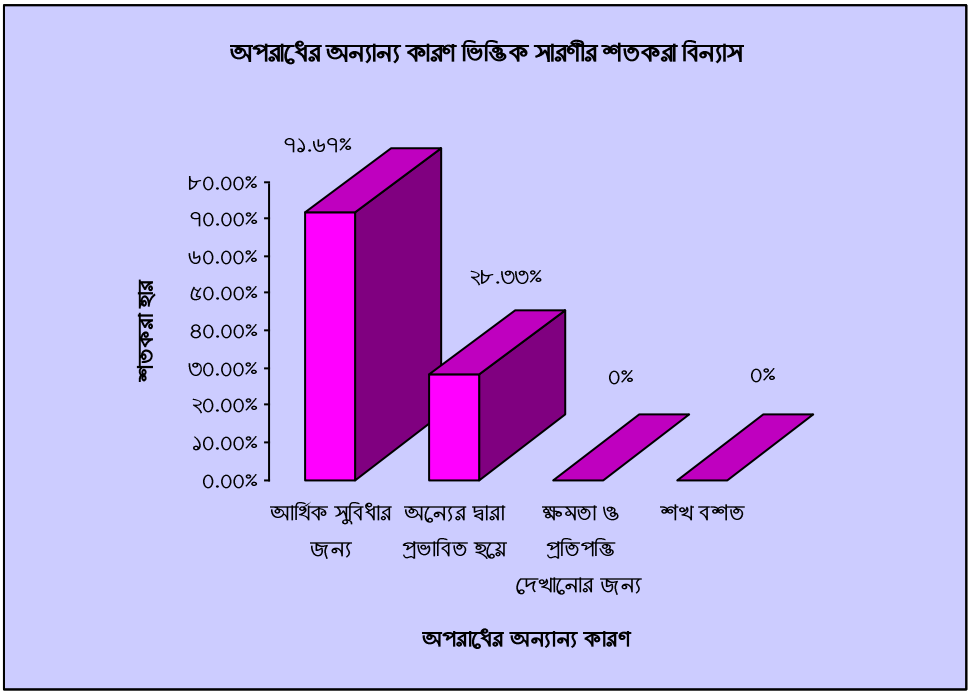

অপরাধের অন্যান্য কারণ ভিত্তিক লেখ

২৬ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে ৭১.৬৭% আর্থিক সুবিধার জন্য,২৮.৩৩% অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অপরাধ করে। সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে উত্তরদাতাদের মধ্যে বেশিরভাগই অর্থের অভাবে অপরাধের সাতে জড়িয়ে পড়ে।

সারণী -২৭

উত্তরদাতাদের অপরাধমূলক অভ্যাস ত্যাগ ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

অপরাধমূলক অভ্যাস ত্যাগ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
লেখাপড়ার মাধ্যমে	৫৫	৪৫.৮৩%
ধর্মীয় চর্চার মাধ্যমে	১৪	১১.৬৭%
সিনিয়রদের উপদেশ শুনে	১৩	১০.৮৩%
খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করে	২০	১৬.৬৭%
অন্যান্য	১৮	১৫.০%
মোট	১২০	১০০%

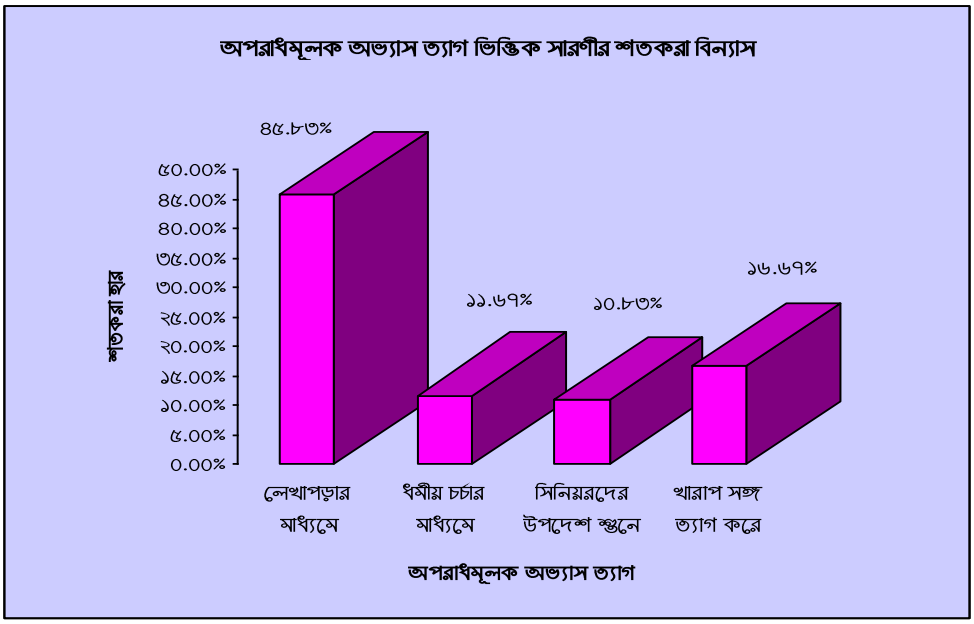

অপরাধমূলক অভ্যাস ত্যাগ ভিত্তিক লেখ

২৭ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে ৪৫.৮৩% -এর মতে লেখাপড়ার মাধ্যমে, ১১.৬৭%- এর মতে ধর্মীয় চর্চার মাধ্যমে, ১০.৮৩% এর মতে সিনিয়রদের উপদেশ শুনে, ১৬.৬৭% এর মতে খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করে এবং ১৫.০% এর মতে অন্যান্যভাবে অপরাধমূলক অভ্যাস ত্যাগ কর যেতে পারে ।

সারণী -২৮

উত্তরদাতাদের অপরাধ প্রবনতায় সামাজিক ক্ষতি ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

সমাজের ক্ষতি	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
যুব সমাজের নৈতিক অধঃপতন	২৬	৩২.৫%
হতাশা গ্রস্থতা	১২	১৪.৪%
দারিদ্রের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া	০	০%
সামাজিক বিশৃঙ্খলা	৪২	৫২.৫%
সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন	০	০%
যুব সমাজের উন্নতির পথ বন্ধ	০	০%
মোট	৮০	১০০%

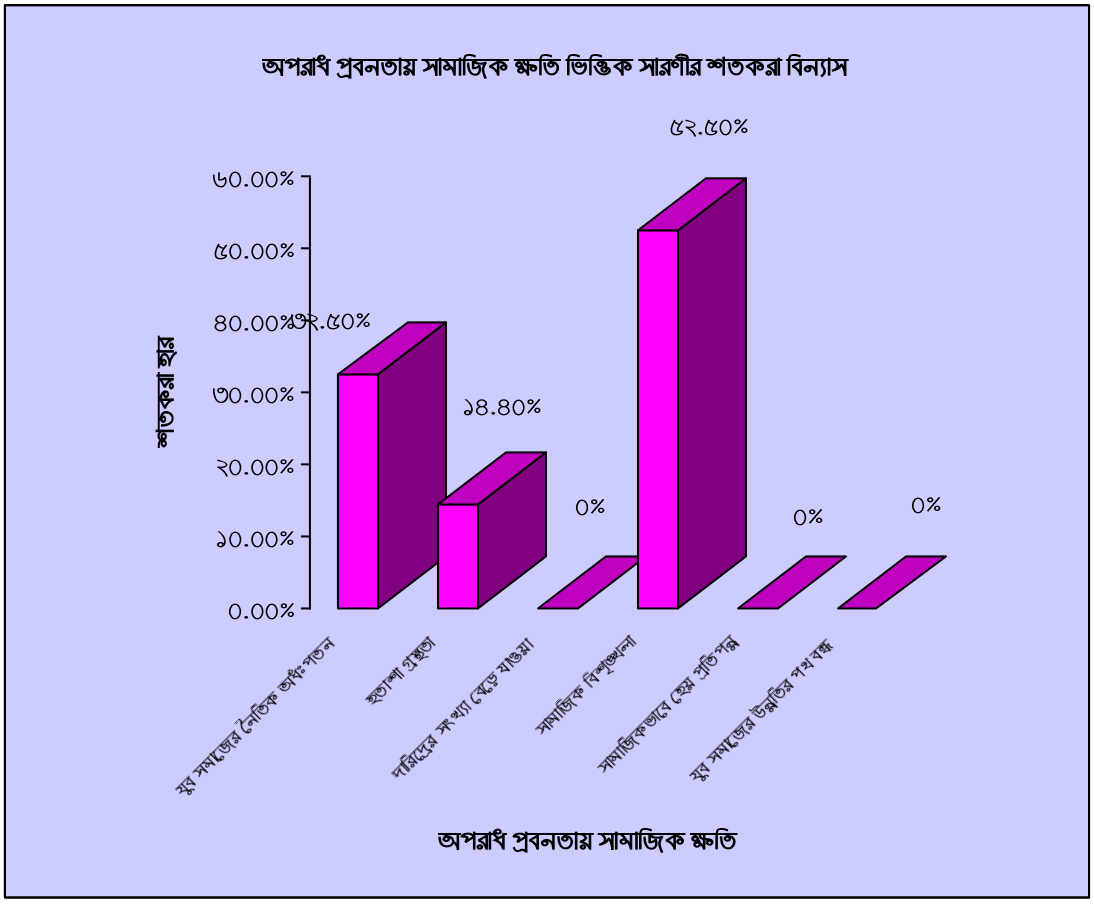

অপরাধ প্রবনতায় সামাজিক ক্ষতি ভিত্তিক লেখ

২৮ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের ৩২.৫%-এর মতে অপরাধ প্রবণতা যুব সমাজের নৈতিক অধঃপতন ঘটায় , ১৪.৪% এর মতে অপরাধ প্রবণতা হতাশা গ্রস্থতা সৃষ্টি করে, ৫২.৫% এর মতে অপরাধ প্রবণতা সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ।

সারণী -২৯

উত্তরদাতাদের অপরাধ সংশোধন তথ্য ভিত্তিক সারণীর শতকরা বিন্যাস :

সংশোধন সম্পর্কে জানা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	২৮	২৩.৩৩%
না	৯২	৭৬.৬৭%
মোট	১২০	১০০%

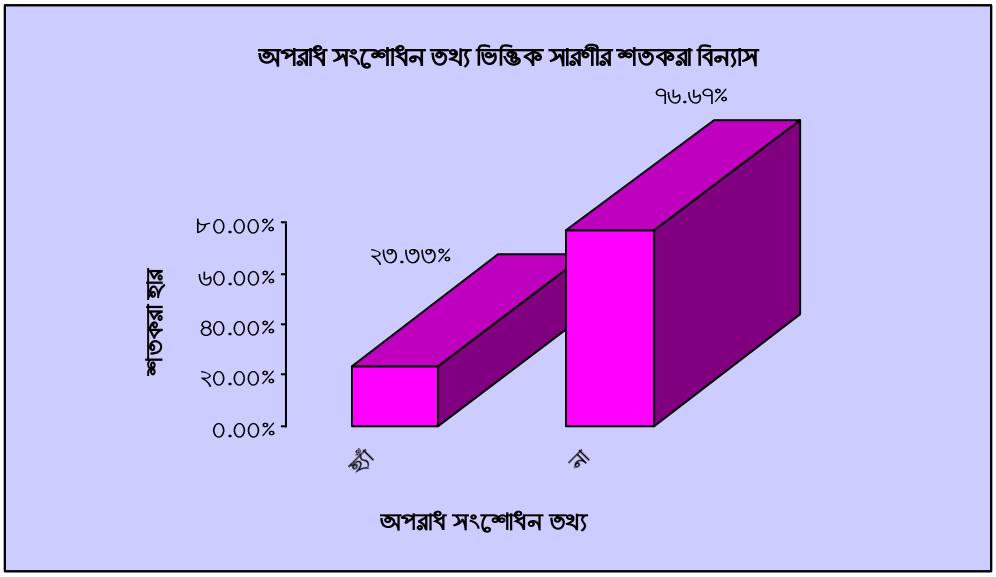

অপরাধ সংশোধন তথ্য ভিত্তিক লেখ

২৯ নং সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের ৭৬.৬৭% কিশোর অপরাধ সংশোধন সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। বাকী ২৩.৩৩ % কিশোর অপরাধ সংশোধন সম্পর্কে জ্ঞান আছে। সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে কিশোর অপরাধের সাথে যুক্ত উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭৬.৬৭ % -এর সংশোধন সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। ফলে যেসব কিশোররা অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে তাদের সংশোধনের ব্যবস্থা হচ্ছে না।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

কেস স্টাডি

কেস নং-১
কেস নং-২
কেস নং-৩

অষ্টম অধ্যায়

কেস স্টাডি

কিশোর অপরাধীদের কাছ থেকে সংগৃহিত তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য মৌলিক চাহিদা পূরণের মান পেশা আয় ও দৈনন্দিন জীবন ধারণ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির সাহায্যে সংগৃহিত তথ্য অনেক কিশোর অপরাধীরই সামগ্রিক দৈনন্দিন জীবনের দিকে তাকালে আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। এ লক্ষে প্রতিনিধিত্ব মূলক কিছু কেসকে নির্দিষ্ট করে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে কেসগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে।

কেস ঃ ১

কিশোর অপরাধীর জন্ম ভিত্তিক তথ্য ঃ

নাম : হাসান শেখ
পিতার নাম: রাজা মিয়া
মাতার নাম : সাহিদাা বেগম
বয়স : ১৫ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা: নবম শ্রেণি
বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম : উত্তর মহাকালী, পোস্ট অফিস : মুন্সীগঞ্জ ১৫০০, উপজেলা : মুন্সীগঞ্জ সদর
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
পেশা : ছাত্র
ধর্ম : ইসলাম
জাতীয়তা : বাংলাদেশী
কেস গ্রহণের তারিখ : ২/১০/২০১৩ খ্রি.

হাসানের পারিবারিক অবস্থাঃ

৫ ভাইবোন এবং মা বাবা নিয়ে হাসানের পরিবার। ভাইবোনের মধ্যে হাসান ২য়। তার বাবা ছোটখাট কাঠের ব্যবসা করেন। হাসানের বড় বোন শারমিন আক্তার দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ে। ভাই অনিক শেক ৫ম শ্রেণিতে পড়ে, অপর বোন সানজিদা আক্তারের বয়স ৪ বছর। ছোট বোন শান্তা আক্তারের বয়স দেড় বছর। হাসান চম্পাতলা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র। হাসানের বাবা পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। সে মাসিক ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা উপার্জন করেন। এই দিয়েই ৭ জনের পরিবার কোন রকমে চলে। হাসানের পরিবার উত্তর মহাকালীতে নিজ বাসায় বসবাস করেন। তবে তাদের কোন কৃষি জমি নেই।

আর্থ-সামাজিক অবস্থা ঃ

হাসানের পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভাল না । হাসানের বাবা যে আয় করেন তা দিয়ে স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে জীবনযাপন করেন । তা আয়ের আর কোন পথও নেই ।

ব্যক্তিগত তথ্যাবলীঃ

হাসানের গায়ের রং কালে । উচ্চতা ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি । ওজন ৩৮ কেজি ।

বিনোদন ব্যবস্থাঃ

হাসানের পরিবারে বিনোদনের কোন ব্যবস্থা বলতে শুধু একটি টেলিভিশন রয়েছে । হাসান একসময় খেলাধুলা করলেও এখন ঘর থেকে বের হয়না । কারো সাথে মিশে না, কোন কথা বলে না ।

অপরাধের বিবরণঃ

প্রতিবেশী ফুফাত বোনকে ধর্ষণ করার অভিযোগে হাসান শেখকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠায় পুলিশ । নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০৩ এর ৯ ধারায় হাসান ও তারবন্ধু হৃদয়কে আসামী করে মামলা করে । ঘটনার পর থেকে হৃদয় পলাতক রয়েছে । হাসানকে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে পাঠায় আদালত । এরপর থেকে হাসান নিয়মিত প্রবশন অফিসারের তত্ত্ববধানে রয়েছে ।

সমস্যা নির্ণয়ঃ

হাসান বন্ধুর পাল্লায় পড়ে ধর্ষনের মত জঘন্য অপরাধে জড়িয়ে পড়ে । এতে তার পড়ালেখা মারাত্নক ক্ষাতগ্রস্ত হয় । পড়ে পরিবারের অনুপ্রেরণায় হাসান আবার স্কুলে আসা শুরু করে । কিন্তু এখনও সে স্বাবাবিক হতে পারেনি ।

মূল্যায়নঃ

না বুঝেই হাসান ধর্ষণের এক জঘন্য অপরাধের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে । এ জন্য তার পরিবারের নজরদারীর অভাব অনেকাংশেই দায়ী । সঠিক পরিচর্যায় শিশু কিশোররা অপরাধী হিসেবে সমাজের বোঝো হয়ে দাড়াঁবে না । এক্ষেত্রে সেমিনার দরকার ।মৌলিক চাহিদা পূরণের সঠিক দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ । তাহলে সেও দেশের আর দশজনের মত সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে । এবং তার জীবনকে উন্নত গতি প্রবাহের সাথে সম্পৃক্ত করে । এবং সমাজে নিজের অবস্থান তৈরীতে সক্ষ মহর ।

কেস ঃ ২

কিশোর অপরাধীর জন্ম ভিত্তিক তথ্য

নাম : মো শাকিল গাজী
পিতার নাম: মো বাসেত গাজী
মাতার নাম : রেখা বেগম
বয়স : ১২ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা: নিরক্ষর
স্থায়ী ঠিকানা : নেয়াখালী সদর, নোয়াখালী
বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম : হাটলক্ষীগঞ্জ, পোস্ট অফিস : মুন্সীগঞ্জ, উপজেলা : মুন্সীগঞ্জ সদর, জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ
পেশা : টোকাই
ধর্ম : ইসলাম
জাতীয়তা : বাংলাদেশী
কেস গ্রহণের তারিখ : ১০/০৯/২০১৩ খ্রি.

শাকিলের পারিবারিক অবস্থা

৫ ভাইবোন এবং মা বাবা নিয়ে শাকিলের পরিবার। ভাইবোনের মধ্যে শাকিল ৩য়। তার বাবা ভাড়ায় রিক্সা চালায়। মা রেখা বেগম রাস্তা নির্মাণ কাজের শ্রমিক। তার পরিবারের কেউই লেখাপড়া করেনি। শাকিল ডাস্টবিন বা ময়লা আজর্না থেকে প্লাস্টিকের বোতল বা অন্যান্য বস্তু সংগ্রহ করে ভাঙ্গারীর দোকে বিক্রি করে। তার বড় ভাই রাকিব ফেরিওয়ালার কাজ করে। ছোট ভাই আরিফ কোন কাজ বা পড়ালেখা করে না। আরিফ একাধিকবার চুরি করে ধরা পড়ে এবং গণপিটুনির সম্মুখীন হয়েছে। শাকিলের বড় ভাই রাকিব নিয়মিত গাজাঁ খায়। শাকিল নিয়মিত ড্যান্ডি সেবন করে। তার ছোট ভাই আরিফও নিয়মিত ড্যান্ডি সেবন করে। শাকিলের বড় বোন কুলসুমের নারায়নগঞ্জে বিয়ে হয়েছে। ছোট বোন ফাতেমার বয়স ৬ বছর। সে এখনও বিদ্যালয়ে যায়নি। শাকিলের পরিবার শহরের হাটলক্ষীগঞ্চ বস্তির এক কক্ষ বিশিষ্ট একটি ভাড়া ছাপরায় গাদাগাদি করে বসবাস করে।

আর্থ-সামাজিক অবস্থা

শাকিলের পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভাল না। শাকিলের আয় দৈনিক ৫০ থেকে ১০০ টাকা। তার ভাই রাকিবও প্রতিদিন ১০০ থেকে ১৫০ টাকা আয় করেন। কিন্তু তারা দু'ভাই যে টাকা আয় করেন তার অধিকাংশই নেশায় খরচ করে ফেলে। তার বাবা রিক্সা চালিয়ে এবং মা রাস্তায় নির্শাণ কাজের শ্রমিক

হিসাবে যা আয় করেন তা দিয়েই কোন ভাবে তারা জীবন যাপন করেন। তাছাড়া তার মা রেখা বেগম জানান. তাদের অনেক টাকা ঋণ রয়েছে। যা ক্রমেই সুদ বাড়ছে।

ব্যক্তিগত তথ্যাবলী

শাকিলের গায়ের রং কালে। উচ্চতা ৪ ফুট। ওজন ৩৫ কেজি। শরীরের চেয়ে হাতগুলো অপেক্ষাকৃত চিকন।

বিনোদন ব্যবস্থা

শাকিলে পরিবারে বিনোদনের কোন ব্যবস্থা নেই। মাটির ঘরে একটা টেবিল আর একটি আলমারি রয়েছে। আর আছে কিছু হড়ি পাতিল,বাটি-চামচ।

অপরাধের বিবরণ

শাকিল মাত্র ১২ বছর বয়সেই নেশার সাথে জড়িয়ে পড়ে। সে চুরি করার কথা স্বীকার না করলেও একাধিকবার চুরির অপবাদে মার খাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। অথচ সে বার বার বলছিল তার ছোট ভাই ১০ বছর বয়সী আরিফ নিয়মিত চুরি করে। নিজের বিষয়টি গোপন করে বার বার ভাইয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে নিয়মিত রাজনৈতিক মিছিল মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করে এবং হরতালে একাধিকবার ঢিল ছুড়ে মেরেছে। এ কাজের জন্য তাকে ১০০ টাকা করে মায়না পায়। শাকিল জানায়, তারা প্রায় ৮০ জন টোকাই আছে, যারা এভাবে রাজনৈতিক কাজে অংশ নেন। রাজনৈতিক নেতারা মাঝে মাঝে তাদের খাওয়ান এবং ঈদে নতুন কাপড় উপহার দেন। শাকিল আরো জানায়, সে বড় হয়ে রাজনীতি করবে এবং রিক্সা চালাবে। ড্যান্ডি সেবনকে সে নেশা হিসেবে মনে করেন না। সারা দিন কাজ করার পর সব বন্ধুরা মিলে মজা করা মনে করে। তাছাড়া সবাই খায়। শাকিলের বাবা-মাও জানেন তাদের তিন ছেলে নেশা করে। কিন্তু এই নিয়ে তাদের কোন হতাশা নেই। সন্তানদের সুমানুষ করার ব্যাপারেও কোন ইচ্ছা আছে বলে মনে হয়নি। যেন এমন পরিবেশেই অভস্ত। এই বস্তির প্রতিটি পরিবারের একই রকম অবস্থা। এই বস্তিতে প্রায় ৩০টি পরিবার বসবাস করছে।

সমস্যা নির্ণয়

শাকিল দরিদ্র পরিবারের সন্তান। জন্মের পর থেকেই সে দারিদ্র্যের মাঝে বড় হয়েছে। মৌলিক মানবিক চাহিদার কোনটিই তার পূরণ হয়নি। এই দারিদ্রতার কারণেই তার পরিবার নোয়াখালীর নিজ গ্রাম ছেড়ে এখানে চলে আসে। তাছাড়া তার চারপাশে পরিবার ও সমাজে মাদকের সহজলভ্যতায় সে সহজেই এর সাথে জড়িয়ে পড়ে। মাদকের নেশায় সে চুরির সাথেও জড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক বিভিন্ন কর্মকান্ডেও রয়েছে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ। খোদ মুন্সীগঞ্জ জেলা শহরের থাকা সত্ত্বেও এই শিশুদের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে পরিবার বা সমাজ বা সরকারের কোন কার্যকরী ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়নি। বরং শহরের বিভিন্ন

অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে এই বস্তির কিশোরদের দ্বারাই। সহজলথ্যতার কারণে মাদক ব্যবসায়ীরাও ব্যবহার করছে এই কিশোরদের।

মূল্যায়নঃ

মাদকের সহজলভ্যতা অনেকক্ষেত্রেই কিশোরকে অপরাধী করে তোলে। মাদকের অর্থ যোগাতে তারা অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে। তার উপর দারিদ্র্য তো আছেই। না বুঝেই শাকিল একাধিক অপরাধের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। পরিবারের অসচেতনতা, উদাসীনতা ও দারিদ্রতার পাশাপাশি পরিবেশও অনেকাংশেই দায়ী। রাজনীতিবীদরা তাদের সুক্ষার পরিবর্তে হীনস্বার্থে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। তা বন্ধ করে এই খিশোরদের দক্ষজনশক্তিতে রূপান্তরের তাদের এ্যাভোকেজির মাধ্যমে মানসিক পরিবর্তনসহ শিক্ষালয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সামাজিক অসাম্য, সংকট, সম্পদের বন্টন, বৈষম্যের কারণেই একটি শিশু অপরাধী হয়ে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

কেস ঃ ৩

কিশোর অপরাধীর জন্ম ভিত্তিক তথ্য ঃ

নাম : মো. রায়হান
পিতার নাম: সেরাজুল মিয়া
মাতার নাম : নাসিমা খাতুন
বয়স : ১৩ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা: তৃতীয় শ্রেণি
বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম : হাটলক্ষীগঞ্জ, পোস্ট অফিস : মুন্সীগঞ্জ, উপজেলা ও জেলা : মুন্সীগঞ্জ
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
পেশা : টোকাই
ধর্ম : ইসলাম
জাতীয়তা : বাংলাদেশী
কেস গ্রহণের তারিখ : ১০/০৯/২০১৩ খ্রি.

রায়হানের পারিবারিক অবস্থাঃ

তিন বোন এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে রায়হান সবার ছোট। রায়হানের বাবা বালুর ড্রেজারে কাজ করেন। এই কাজ করে সে ভালো টাকাই রোজগার করেন। কিন্তু ৭/৮ বছর আগে তার বাবা তাদের ফেলে চলে যান। শোনা গেছে অন্যত্র গিয়ে আরেকটি বিয়ে করেছেন। এরপর আর রায়হানদের কোন খোঁজ করেনি এই বাবা। তার মা অনেক কষ্টে মানুষের বাসায় কাজ করে দুই মেয়ে রুমা ও মালাকে বিয়ে দেন। অপর মেয়ে সাথী মানিকগঞ্জের একটি মাদ্রাসায় পড়ে। রায়হানের বড় ভাই শাওন টেম্পোর হেলপার হিসেবে কাজ করেন। রায়হান, তার ভাই শাওন এবং তার মা শহরের হাটলক্ষীগঞ্জের এক কক্ষের একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করেন। রায়হানের মার ডান হাতে সমস্যার কারণে এখন আর কাজ করতে পারে না। শাওন দিন প্রতি ১০০ থেকে ১২০ টাকা আয় করেন। আর রায়হান ৮০ থেকে ১০০ টাকা আয় করে। রায়হান জানায় প্রথমে সে একটা মাদ্রাসায় পড়ত। পরে চুরি করার অপরাধে রায়হানকে মাদ্রাসা থেকে বের করে দেয়। তবে তারা কোন পুলিশ কেস করেননি। পরে সে মুন্সীগঞ্জ শহরের ইদ্রাকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে। সেখানে সহপাঠীদের সাথে মারামারির পর রায়হানকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয়। পরে সে টোকাইয়ের কাজে যোগ দেন। রায়হান সকালে বের হয এবয় সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন অলিগলি ঘুরে বেড়ায়। পরে সন্ধ্যায় বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ভান্ডারী দোকানে এগুলো বিক্রি করে। রায়হান নিয়মিত সিগারেট এবং গাঁজা খায়। তবে রায়হানের ভাই শাওন নেশা করে না। তবে সে মাসের অর্ধেক সময়ই কাজে যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

আর্থ-সামাজিক অবস্থাঃ

রায়হানের পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভাল না। রায়হানের দৈনিক আয় ৮০ থেকে ১০০ টাকা। তার ভাই শাওন প্রতিদিন ১০০ থেকে ১২০ টাকা আয় করেন। কিন্তু তারা দু'ভাই যে টাকা আয় করেন তা দিয়ে ছোট বোনের মাদ্রাসার খরচ এবং সংসার চলে। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে তাদের সংসারে অভাব লেগেই থাকে।

ব্যক্তিগত তথ্যাবলীঃ

শাকিলের গায়ের রং সাদা। উচ্চতা ৪ ফুট ১ইঞ্চি। ওজন ৩৬ কেজি।

বিনোদন ব্যবস্থাঃ

রায়হানের বাড়িতে একটি টেলিভিশন আছে।

অপরাধের বিবরণঃ

রায়হান মাত্র ১৩ বছর বয়সেই সিগারেট,গাঁজার মত নেশার সাথে জড়িয়ে পড়ে। সে অল্প বযসেই চুরি করে একাধিকবার ধরা পড়েছে। তবে চুরি করা খারাপ কাজ বলে সে মনে করেন। ভবিষ্যতে আর চুরি না করার চেষ্টা করবে । চুরি করতে সে চায় না বলে জানান। কিন্তু চুরি করে ফেলে। রায়হান নিয়মিত রাজনৈতিক মিছল মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেন। এ কাজের জন্য তাকে ১০০ টাকা করে দেয়া হয়েছে। রাজনৈতিক নেতারা খাওয়ান এবং ঈদে নতুন কাপড় উপহার দেন। ভাড়ায় নিয়ে যায় নানা যায়গায়। রায়হান জানান, কতিপয় পুলিশ সদস্যের সাথেও তাদের বিশেষ সখ্যতা আছে। তাই তাকে পুলিশ ধরে না, বরং নানা সময় পুরস্কৃত করে। শহরের পুরনো কাছারী এলাকার জিপসি ফুড নামের একটি প্রতিষ্ঠানের পাশেই তাদের দল বেধে থাকতে দেখা যায়। রায়হানদের মত এখানে এমন শিশুর অংখ্যা প্রায় ৮র বলে জানিয়েছে রায়হান। ডাস্টবিনসহ নানা এলাকা থেকে পানির খালি বেতালসহ নানা কিছু বস্তায় ভরে এখানে এনেই জমা করে। পরে এখান থেকেই তাদের এসব জিনিসপত্র যায় ভাঙ্গারী দোকানে। এসব কাজের জন্য দিন প্রতি গড়ে ৭০ টাকা করে দেয়া হয়। এই টাকা ভাঙ্গারী দোকানের মালিকের মাধ্যমে দেয়া হলেও মাঝখানে রয়েছে এক প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনিও এখান থেকে একটি অংশ পাচ্ছেন বলে জানায় রায়হান। তাই তাদের এখানে প্রশয় দেয়া হয়। এছাড়া কখনও মূল্যবান কিছু চুরি করে আনলেও সেজন্য ১০/৫ টাকা ছাড়ার তেমন কোন সুবিধা পায় না রায়হানরা। জিপিসি ফুড লাগ ঘেষা এই প্রভাবশালীর একটি অফিসের মত রয়েছে। এখানে বসেই সবকিছু পরিচালনা হয়। এসব কারণে এসব শিশুদের ব্যাপারে কেউ প্রতিবাদ করেও রেহায় নেই। তাদের সাথে কেই খারাপ ব্যবহার করলেও এই ভাই (বিপুল ভাই) ছুটে যান তাদের রক্ষায়।

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যা নির্ণয়ঃ

রায়হান দরিদ্র পরিবারের সন্তান। বাবা পরিবারটিকে অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে যাওয়ার কারণে চরম বিপাকে পরে। বেঁচে থাকার তাগিদে কিশোর বয়সে কাজের জন্য বের হয়। জন্মের পর থেকেই সে দারিদ্র্যতা ও পারিবারিক সঙ্কটে মাঝে বড় হয়েছে। মৌলিক মানবিক চাহিদার কোনটিই তার পূরণ হয়নি। প্রয়োজন পূরনে চুরির মত জঘন্য কাজ করতেও সে পিছপা হয়নি। তাছাড়া তার চারপাশে পরিবার ও সমাজে মাদকের সহজলভ্যতায় সে সহজেই এর সাথে জড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক বিভিন্ন কর্মকান্ডেও রয়েছে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ।

মূল্যায়নঃ

কিশোর অপরাধীরা সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের সমন্বিত উদ্যোগে অবশ্যই এইসব অপরাধীদের চরিত্র সংশোধন করে স্বভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তাতে শুধু কিশোর অপরাধীরা নয় পুরো সমাজ ও রাষ্ট্রেরই মঙ্গল হবে।

এই তিনটি কেস স্টাডি থেকে প্রতিয়মান হয় যে, কিশোর অপরাধীদের জীবন বৈচিত্রময় এবং তারা বেশীর ভাগই পথ শিশু (Street Children). এসব শিশুরা অনাদর আর অযত্নে বেড়ে উঠছে সমাজের বোঝা হয়ে। মাদক, চুরি, ছিনতাই, নারী নির্যাতনসহ নানাবিধ অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। ব্যবহৃত হচ্ছে রাজনৈতিক কর্মকান্ডেও। কোমল মতি এসব পথশিশুরা অবাধে ব্যবহৃত হচ্ছে রাজনৈতিক মিছিল মিটিংসহ নানা কাজে। যে সময় হাতে থাকার কথা খাতা-কলম তখন তাকছে মরণ নেসা। কিশোররা বুঝে কিংবা না বুঝেই নানা রকম অপকর্ম এবং ঝুকিপূর্ণ কাজে জড়িয়ে পড়ছে। এসব কিশোরদের পাশাপাশি আশপাশের অন্য কিশোরদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে অপরাধ। এসই পথ শিশুদের দেয়া তথ্যমতে অন্তত ৮০ কিশোর একত্রে এসব নানা অপরাধের সাথে জড়িয়ে রয়েছে। এই সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। এসব কিশোরদের প্রশয় দিচ্ছে মাদকের গড ফাদার, কতিপয় পুলিশ এবং স্বার্থানেষী প্রভাবশালীরা। তাই নানা অপরাধ করেও তারা পার পেয়ে যাচ্ছে। তাই বেপরোয়াভাবে নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা মূলক থাকলেও এসব শিশুদের স্কুলে পাঠানোর ক্ষেত্রে যেমন উদাসীন পরিবার। তেমনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও। এসব বেশীরভাগ শিশুদের বাসস্থান শহরের লেঞ্চঘাটের কাছে হাটলক্ষীগঞ্জের কাছেই রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়। কিন্তু সেখানে এসব পথ শিশু তথারা না গিয়ে সময় কাটাচ্ছে নোষা শহরের বিভিন্ন এলাকায় চুরি ছিনতাই করে। এরাই একমসয় সমাজের আরও বড় ধরনের হুমকির সৃষ্টি করবে। পরিবারগুলোতে পরিবার পরিকল্পনারও কোন বলাই নেই। এসব পরিবার থেকে যারা জন্ম নিচ্ছে তারা নানা রোগ ব্যাধিসহ সমাজের বোঝা সৃষ্টি করছে। পরিবারগুলোতে অসচেতনতা, বহু বিবাহ, নৈতিকতার অভাব, দারিদ্র্যতা এবং অশিক্ষার কারণে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। পরিবারগুলোকে সচেতন এবং শিশুদের এখনই সুপথে আনা জরুরি। মুন্সীগঞ্জে বেশ কিছু এনজিও থাতলেও এসব পরিবার ও শিশুদের নিয়ে কোন কার্যক্রম চোখে পড়েনি। তাই প্রতিদিন এসব শিশুরা শহরের পুরনো কাছারীর জিপিসি ফুড এলাকার আসপাশে অবস্থান নেয়। এখান থেকে তাদের কর্মকান্ড

ছড়িয়ে পড়ে। এই জিপিসি ফুডের পাটনার এবং একটি রাজনৈতিক দলের নেতার ছত্রছায়ায় এরা কর্মকান্ড পরিচালনা করছে বলে জানিয়েছে। বৈচিত্রময় এসব পথশিশুদের বিপথ থেকে রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকলের কার্যকরী ভূমিকা জরুরি।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

গবেষণার মূল ফলাফল, সীমাবদ্ধতা ও সুপারিশামালা

৯.১ গবেষণার মূল ফলাফল
৯.২.গবেষণার সীমাবদ্ধতা
৯.৩. গবেষণার সুপারিশ
৯.৪. উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

গবেষণার মূল ফলাফল, সীমাবদ্ধতা ও সুপারিশামালা

৯.১ গবেষণার মূল ফলাফল ঃ

কিশোর অপরাধের কারণ শীর্ষক গবেষণাটি মূলত একটি বর্ণনামূলক গবেষণা। এখানে নমুনা জরিপ গবেষণা প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। উক্ত গবেষণায় যে সকল কারণে কিশোর অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে, এর প্রভাব, প্রকৃতি,স্বরুপ, প্রক্রিয়া এবং এর সাথে অন্যান্য বিষয়গুলোর অনুসন্ধান করা এ সকল উদ্দেশ্য সামনে রেখে গবেষণাটি করতে গিয়ে যে বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে তা হলো অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণ, অপরাধ প্রতিরোধ, সুপারিশসমূহ। আর এ সব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করাই ছিল গবেষণাটির মূল উদ্দেশ্য। গবেষণা এলাকা হিসেবে উদ্দেশ্যমূলকভাবে মুন্সীগঞ্জ শহরের বিভিন্ন গ্রাম নির্বাচিত করা হয়েছে। নির্বাচিত এলাকার মধ্য থেকে সরল দৈবচারিত নমুনায়ন পদ্ধতিতে ১২০ জন কিশোর নির্বাচন করা হয় এবং তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নে গবেষনার মূল ফলাফল উপস্থাপন করা হল-

উপরোক্ত সারণীর শতকরা বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, মুন্সীগঞ্জ শহরে কিশোর অপরাধের সাথে যুক্ত ১২০ উত্তরদাতার মধ্যে ঃ

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে ১০% এর বয়স ৭ থেকে ৯ বছরের মধ্যে, ৪০%-এর বয়স ১০ থেকে ১২ বছরের মধ্যে , ২৬-৬৭ %-এর বয়স ১৩ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে এবং ২৩.৩৪%-এর বয়স ১৬ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। দেখা যায় যে ১০ থেকে ১২ বছর বয়সের শিশু-কিশোররাই বেশী অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়েছে। এই বয়সেই তাদের শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তন ঘটে। অনেকে নিজের ভাল মন্দ বুঝে ওঠার আগেই অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। এই বয়সেই তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এদের মধ্যে ৫২.৫০% দারিদ্র্যের কারনে বিভিন্ন অপরাধের সাথে যুক্ত হচ্ছে এবং ২৯.১৭% বেকারত্বের কারনে, ১০% খারাপ সঙ্গের কারনে, ৬.৬৭% হতাশা গ্রস্থতার কারনে ও ১.৬৭% অন্যান্য কারনে অপরাধের সাথে লিপ্ত।

উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে ৯৩.৩৩ % কিশোর এবং ৬.৬৭ % কিশোরী অপরাধের সাথে জড়িত। দেখা যাচ্ছে যে কিশোরীদের তুলনায় কিশোরা অনেক বেশী অপরাধের সাথে জড়িত। উত্তরদাতাদের মধ্যে কিশোর অপরাধের সাথে জড়িত ৪৬.৬৭% গ্রাম বা অন্য শহর থেকে এসেছে এবং তাদের এই শহরে আসার প্রধান কারন হল প্রকট দারিদ্র্য। এদের মধ্যে ৫১.৭৯% দারিদ্র্যের কারনে এবং ৪৬.৪৩% প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারনে অন্য শহর থেকে এই শহরে বসবাস করছে।

কিশোর অপরাধীদের মধ্যে ১৬.৬৭ % উত্তরদাতার অভিভাবক ব্যবসা করেন, ৩.৩৩ % চাকুরী করেন, বাকী ৮০% উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীর অভিভাবক অন্যাণ্য কাজ যেমন- ভ্যান চালক, রিক্সা চালক, দিনমজুরের কাজ করেন। এদের মধ্যে ৩৫.৮৪% অভিভাবক ৫০০০-৬০০০ টাকা আয় করেন যা

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মৌলিক ও নূন্যতম চাহিদা মিটিয়ে সুস্ঠু জীবন যাপনের জন্য প্রযোজ্য নয়। বাকী ৬০০০-৭০০০ টাকার মধ্যে ২৮.৩৩%, ৮০০০-৯০০০ টাকার মধ্যে ৮.৩৩%% অভিভাবকের মাসিক আয়, ৯০০০-১০০০০ টাকার মধ্যে ৭.৫০% অভিভাবকের মাসিক আয়, ১০০০০-১২০০০ টাকার মধ্যে ১০.৮৩% অভিভাবকের মাসিক আয়। উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে ৭০% -এর একক পরিবারে বাস করে। বাকী ৩০% যোথ পরিবারে বাস করে। তাদের মধ্যে ৮৮.৩৩% এর কোন নিজস্ব বাসা নেই। তাদের ৭১.৬৭% এর বাসস্থান কাঁচা এবং ৫৫ জনের বাসায় বিনোদনের ব্যবস্থা আছে । এদের মধ্যে ৯০% বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করেন এবং ৭৫% বিশুদ্ধ পানি হিসেবে টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করেন।

উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে এদের মধ্যে ৮০ জন কোন না কোন অপরাধের সাথে যুক্ত যার মধ্যে চুরির মত অপরাধে লিপ্ত প্রায় ৬৫%, ১৭.৫% টোকাই, ১০% ছিনতাই এবং ৭.৫% হল পকেটমার। এদের মধ্যে প্রায় ৬৮.৩৩% কোন না কোন অপরাধী সম্পর্কে জানেন।

উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে ১৩.৫০% অপরাধের কারণে মাসিক সাঁজা পেয়েছেন। এদের মধ্যে প্রায় ৬৮.৩৩% রাজনৈতিক নাশকতামূলক কাজে অংশগ্রহন করে।

এই কিশোর অপরাধীদের বন্ধুদের মধ্যে প্রায় ৮৮.৩৩% নেশা করে এবং ৩৪.১৭% গাঁজা, ২৮.৩৩%, ধূমপান ও ২৫.৮৩% ইয়াবা সেবন করে। প্রায় ৮৮.৩৩% নেশা করে। এদের মধ্যে প্রায় ৭১.৬৭% আর্থিক সুবিধার জন্য অপরাধ করে। এই অপরাধীরা জানে সমাজের লোকদের মধ্যে ৫৫% এই অপরাধগুলোকে খুব খারাপ দৃষ্টিতে দেখে।

উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে ২১.৬৭ % লেখাপড়া, ১১.৬৭ কাজে নিযুক্ত, ২৩ .৩৩ % বেকার এবং ৪৩.৩৩ % অন্যান্য কাজে নিয়োজিত। এই কিশোর অপরাধীদের মধ্যে ৭১.৬৭ % আর্থিক সুবিধার জন্য এবং ২৮.৩৩% অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অপরাধ করে থাকে। এদের মধ্যে ৪৫.৮৩% মনে করেন লেখাপড়ার মাধ্যমে, ১১.৬৭ % মনে করেন ধর্মীয় চর্চার মাধ্যমে, ১০.৮৩ % মনে করেন সিনিয়রদের উপদেশ শুনে, ১৬.৬৭ % মনে করেন খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করে এবং ১৫% মনে করেন অন্যান্যভাবে অপরাধমূলক অভ্যাস ত্যাগ করা সম্ভব। উত্তরদাতা কিশোর অপরাধীদের মধ্যে ৭৬.৬৭% ই অপরাধ সংশোধন সম্পর্কে জানেন না।

‘শিশু অপরাধ করে না ভুল করে” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে যুগোপযোগী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আইনের সংস্পর্শে আসা প্রত্যেকটি শিশুকে দেশের সম্পদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাদেরকে সংশোধনের মাধ্যমে আগামীর ভবিষ্যৎ জাতি গঠনে অংশীদার করতে হবে এখন থেকেই। প্রতিটি জেলায় একটি করে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিশু কিশোরদের সংশোধনের হার বৃদ্ধি করতে হবে। একই সাথে প্রতিবন্ধি শিশু কিশোরদেরকে সরকারী সহায়তায় এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে সাবলম্বী করা যেতে পারে। আমাদের আশে-পাশের প্রতিটি শিশু হয়ে উঠুক আগামীর আশার আলো, দেশ তথা একটি সুস্থ্য-সুন্দর জাতি গঠনে প্রতিটি শিশু অবদান রাখুক, হয়ে উঠুক একটি উন্নত জাতি গঠনের অংশীদার।

Dhaka University Institutional Repository

৯.২ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ঃ

শিশু-কিশোররা জাতি তথা সমাজের বিশেষ করে এক একটি পরিবারের ভবিষ্যৎ। মাতা-পিতা, অভিভাবক এবং সমাজ সচেতন ব্যক্তি মাত্রই শিশু-কিশোরদের অপরাধ জনিত আচরণে উদ্বিগ্ন ও ভীত হতে বাধ্য হয়। কারন এ ধরনের আচরণের পরিনতি যেমন শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য ভয়াবহ, তেমনি সবাজ তথা দেশের জন্যও ক্ষতিকর। শিশু কিশোর বা কিশোরীর অপরাধে জড়িত হলে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাদের বিচার কার্য পরিচালনা করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারন, কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। বর্তমান বিশেষ শিশু-কিশোরদের বিচার ব্যবস্থায় শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশেও শিশু-কিশোরদের বিচার প্রক্রিয়ায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট অপরাধীরার সংশোধনের সুযোগ দ্বারা কতটুকু সুফল ভোগ করছে বা উপকৃত হচ্ছে তা যাচাই করার জন্যই আলোচ্য গবেষণার টার্গেট গ্রুপ হচ্ছে অপরাধের সঙ্গে জড়িত শিশু-কিশোর।

অলোচ্য গবেষণাটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমার সার্বিক প্রচেষ্টা এবং আন্তরিকতার কোন ঘটিত না থাকলেৈও কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা আমি অনুভব করেছি। যে কোন গবেষণা সময় সাপেক্ষ। তারপরও গবেষণাকে সুচারু রূপে সম্পন্ন করার জন্য আর্থ-সামাজিক পরিবেশ প্রয়োজন। বর্তমান গবেষণাটি ব্যাপক আকারে করা যেত। তবে সময়ের স্বল্পতা, গবেষণাকাজের প্রকৃতি ও তথ্য সংগ্রহের ধরণ বিবেচনা করে গবেষণার কাজ মাত্র ১২০ জন কিশোরের উপর সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। নিম্নে গবেষণার সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা হলো ঃ

* গবেষণাটি শুধু কিশোরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এর পাশাপাশি যদি যাদের দ্বারা এইসব কিশোররা অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে তাদেরও গবেষণায় অর্ন্তভূক্ত করা যেত তাহলে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হতো।

* গবেষণাটি করা হয়েছিল মাত্র ১২০ জন কিশোরদের নিয়ে। যদি জেলার সকল কিশোর অপরাধীদের উপর গবেষণাটি করা সম্ভব হতো তাহলে কিশোর অপরাধের যর্থার্থ কারণ সম্পর্কে আরও পরিসংখ্যানিক তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হতো।

* গবেষণাটি সম্পন্ন করার জন্য সময় কম ছিল। যার দরুণ উক্ত বিষয়টির সার্বিক দিক তুলে ধরতে পারিনি। সময় আরও বেশী পাওয়া গেলে বার বার সাক্ষাৎকালে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেড়িয়ে আসত।

* জেলখানায় অনেক দাগী অপরাধী রয়েছে। নিরাপত্তার কারণে গবেষণার কাজে সেখানে অবাধে প্রবেশ করতে পারিনি। তাই সেখানে অবস্থানরত কিশোর অপরাধীদের সাথে অবাধে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

* কিশোরদের সাথে একা আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। আলোচনা করার সময় কেউ না কেউ উপস্থিত ছিল। তাই অনেক সময় কিশোর অপরাধীরা মন খুলে কথা বলতে পারেনি।

*কিশোররা অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে চায়নি। তাদের থেকে উত্তর বের করতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। অনেক সময় তারা ভূল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্তও করেছে।

*অনেকেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আর্থিক সাহায্য আশা করে। আর্থিক সাহায্য না পেয়ে অনেকেই আশাহত হয়ে প্রশ্নের ভূল উত্তর দিয়ে থাকেন।

*মুন্সীগঞ্জ জেলায় কিশোর অপরাধীদের জন্য আলাদা কোন হাজত নেই। এ জেলার কিশোর অপরাধীরা জেলখানায় দাগী আসামীদের সাথে হাজতে থাকে। ফলে দাগী আসামীদের সংমিশ্রনে তারা একসময় দাগী আসামী হয়ে উঠে।

*গবেষণায় ব্যবহৃত সাক্ষাৎকার অনুসূচীর পূর্বে পরীক্ষণ করা হলেও কিছু কিছু অসঙ্গতি পরিবর্তীতে পরিলক্ষিত হয়েছে। গবেষণা শেষে মনে হয়েছে আরো সতর্ক হলে সাক্ষাৎকার অনুসূচী আরো উন্নত করা যেত।

*একটি সৃষ্টিশীল গবেষণা পরিচলনা করতে গেলে সময় ও অভিজ্ঞতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সীমিত সময় এবং অনভিজ্ঞতা গবেষণাটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে কম বেশি সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

*তথ্য সংগ্রহের জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহনের সময় যে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ দরকার তা অনেক ক্ষেত্রেই বজায় রাখা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি।

*উত্তরদাতাদের অজ্ঞতার কারণে অনেক সময় তারা সাক্ষাৎকার দিতে অনীহা প্রকাশ করেছেন। আবার সঠিক তথ্য গোপন করার চেষ্টাও করেছেন। তবে সেসব ক্ষেত্রে তাদের সাথে কথা বলা অপেক্ষাকৃত অধিক সময় ব্যয় করতে হয়েছে।

*উত্তরদাতাদের অনেকেই নিজের বয়স এবং তাদের অভিভাবকের মাসিক আয়-ব্যয়ের সঠিক উত্তরদানে সক্ষম হয়ে ওঠেনি। এক্ষেত্রে আমি তাদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে এসব প্রশ্নের সঠিক তথ্য বের করার চেষ্টা করেছি এবং কখনো কখনো নিজস্ব অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করেছি।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের কিশোররা পারিবারিক ও সামাজিকভাবে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা যাচাই করাই আমাদের এই গবেষণাটির মূল উদ্দেশ্য। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে উক্ত গবেষণাটির সব দিক তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। উপর্যুক্ত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও একজন শিক্ষার্থী গবেষক হিসেবে আমি গবেষণাটি যথাযথ আন্তরিকতা, সততা, কর্তব্য নিষ্ঠা এবং পেশাগত মূল্যবোধের আলোকে সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি অভিজ্ঞ তত্ত্বাবধায়কের সুযোগ্য নির্দেশনায় গবেষণাটি মান সম্মত হয়েছে। গবেষণাটির তথ্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

৯.৩ গবেষণার সুপারিশমালা ঃ

সামাজিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও পরিবেশগত কারণে কিশোরদের মনে অপরাধ জন্ম নেয়। প্রাচুর্য,চরম দারিদ্র্য সামাজিক ও পারিবারিক উপেক্ষা ইত্যাদির ফলেও অপরাধের দিকে ঝুঁকে পড়ে অনেক কিশোর। আবার অনেক ক্ষেত্রে সমাজে বিত্তশালী মা-বাবার উদাসীনতা, স্নেহহীনতা,বিত্ত-বৈভবের কাল ও কিশোর অপরাধ বৃদ্ধি পায়।

অন্যান্য সামাজিক সমস্যার ন্যায় কিশোর অপরাধ অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সকল সমাজেই এর অনিবার্য উপস্থিত রয়েছে। তবে প্রকৃতি ও মাত্রাগত দিক থেকে অভিন্ন নয়। এটি বাংলাদেশেও একটি স্বীকৃত সমস্যা। বাংলাদেশে শিশু আইন, ১৯৭৪ এর প্রয়োগ থেকেই এই সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করা যা। সুতরাং অপরাধ প্রবণতার জন্য একজন কিশোর যতটা না দায়ী তার চেয়ে বেশি দায়-দায়িত্ব সমাজের।

যে কোন গবেষণার বৈশিষ্ট হল সেই গবেষণার আরো একাধিক নতুন গবেষণার দ্বার উন্মোচন করে। আলোচ্য গবেষণাটি একটি নতুন গবেষণা। অতীতে বিচ্ছিন্নভাবে অংশবিশেষ নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা হলেও সময়ের ভিন্নতার প্রেক্ষিতে তা ফলপ্রসূ অবদান রাখতে সম্পূর্ণ নয়। বর্তমানে শিশু-কিশোরদের গুরুতর অপরাধে জড়িয়ে পড়ার প্রধান কারণ মাদক সেবন এবং পরবর্তী সময়ে মাদক ব্যবসায় জড়িত হওয়া। এই মাদক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হলে শিশু-কিশোরদের অপরাধ অনেকটা হ্রাস পাবে। আর শিশু-কিশোরদের সুস্থ বিনোদন যেমন- খেলাধুলা, সংগীত, বইপড়া, শিক্ষাসফর, দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। সুস্থ বিনোদনের অভাব থাকলে শিশু-কিশোরদের অতি কোমল স্পর্শকাতর মনে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে বাধ্য। সেইসঙ্গে অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। জনপ্রিয় স্লোগান- আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। বর্তমান প্রজন্মের শিশু-কিশোরদের স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ না ঘটলে জাতির জন্য ভবিষ্যতে মেধাবী নেতৃত্ব পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়বে। সুতরাং এখনই শিশু-কিশোরদের মঙ্গল ও কল্যাণের ব্যাপারে রাষ্ট্র তথা সরকার ও অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নিতে হবে। তাই আলোচ্য সম্পাদিত গবেষণার প্রেক্ষিতে কিশোর অপরাধের প্রভাব, নিয়ন্ত্রন ও সংশোধনের পদক্ষেপকে অধিক ফলপ্রসূ করার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশমালা পর্যালোচনা আকারে উপস্থাপন করছি ঃ

* শিশুদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় সমাজে কিছু বিধি নিষেধ রয়েছে। রয়েছে কিছু আইন। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই আইনের প্রয়োগ হচ্ছে না। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

*এদেশের অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র। তারা মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে অক্ষম হয়ে অপরাধের সাথে নিজেকে যুক্ত করে ফেলে। মৌলিক অধিকার ব্যবস্থা নি্চিত করতে হবে।

* বস্তি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। বস্তিতে শিশু কিশোররা নোংরা পরিবেশে অযত্ন-অবহেলা, অসৎ সঙ্গে বড় হয়। এক সময় তারা অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে। বস্তি উচ্ছেদ করে পূর্ণবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

*রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কর্মসূচির সময় শিশুদের ব্যবহার করে। রাজনৈতিক নাশকতা সৃষ্টিতে দলগুলো কিশোরদের অর্থের লোভ দেখিয়ে ব্যবহার করে থাকে। বিভিন্ন হরতাল, পিকেটিং, বোমা বানানো, বোমা ছোড়া এবং অন্যান্য ভয়ঙ্কর কর্মকান্ডে যেনো শিশুদের ব্যবহার করা না হয় সে বিষয়ে জনমত গড়ে তোলার উদ্যেগ নিতে হবে। কারণ এর সাথে যুক্ত থাকতে থাকতে কিশোররা এক সময় পুরোপুরি অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক বেড়াজাল থেকে কিশোরদেরকে মুক্ত রাখতে হবে।

* গঠনমূলক চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্রমবর্ধমান নগরায়ন প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশে বেশীরভাগ শিশু-কিশোরদের সুষ্ঠু বিনোদন ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না।হারিয়ে যাচ্ছে খেলার মাঠ। কিশোররা এখন টেলিভিশন, কম্পিউটার,মোবাইলফোন, ফেইসবুক,আড্ডাবাজিতেই ব্যস্ত থাকে। তাদের সঠিক মানসিক বিকাশের পথ ক্রমেই রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। শিশু-কিশোরদের খেলাধুলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে। কিশোরদের চিত্তবিনোদনের জন্য মাঝে মাঝে ডকুমেন্টরী ফিল্ম দেখানো যেতে পারে। এতে তারা বিভিন্ন এলাকার মানুষ ও জীব বস্তুর জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে পারবে।

* শিশু কিশোরদের অপরাধ প্রবণতা রোধে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করতে হবে। পারিবারিক আদর্শ ও মূল্যবোধের চর্চা বাড়াতে হবে।

* পারিবারিক পরিবেশ গঠনমূলক রাখতে হবে। হিংসা ও কলহমুক্ত হতে হবে পরিবার। পরিবারের সকল সদস্যদের একে অপরকে শ্রদ্ধা,সম্মান ও স্নেহ করতে হবে। তবেই সে পরিবারে শিশুরা নিরাপদ বোধ করবে। এবং আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে।

* পারিবারিক অস্বচ্ছলতা দূর করতে হবে। শিশু-কিশোরদের মৌলিক মানবিক চাহিদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

* প্রাকৃতিক দুর্যোগে যেসব শিশু-কিশোর পিতামাতা-অভিভাবক হারিয়ে নি:স্ব হয় তাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তারা যাতে বিপথে চলে না যায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

* পরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। অধিক হারে শিল্পায়ন ও শহরায়ন রোধ করতে হবে।

* আমাদের দেশে মাদকের সহজলভ্যতা কিশোর অপরাধের অণ্যতম প্রধান কারণ। মাদকের নেশায় ছোট ছোট অপরাধ করতে করতে একসময় সে দাগী আসামী হয়ে যায়। অস্ত্র ও মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা দূর করতে হবে।

* সন্তানের প্রতি পিতামাতার আরও যত্নবান হতে হবে। অসৎ সঙ্গ থেকে সন্তানকে দূরে রাখা অভিভাবকের দায়িত্ব। সে কোথায় যায়, কার সাথে মিশে, কি করছে এ সব বিষয়ে সবসময় অভিভাবককে সচেতন হতে হবে।

* শ্রেণি বিদ্বেষ দূর করতে হবে। সকল শিশুদের সমান ভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিতে হবে। নিজের প্রতি আস্থা স্থাপনে সক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে না।

* শিশুদের খারাপ সঙ্গ ও অসামাজিক লোকদের থেকে দূরে রাখতে হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরিবেশের মান উন্নয়ন করার ব্যবস্থা করতে হবে। তাত্ত্বিক শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে।

* ১৯৭৪ সালের চিলড্রেন্স অ্যাক্টের পরিমার্জন-নয়তো সংশোধন প্রয়োজন। ওই আইনের পরে যে সব নতুন নতুন আইন তৈরি হয়েছে এবং শিশু সনদ ঘোষণার পর বিশ্ব ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এ পরিবর্তন জরুরী।

* যেকোন আইনের রূঢ় প্রয়োগ থেকে ১৮ বছরের নিচের বয়স পর্যন্ত শিশুদের বাঁচাতে হবে। তবে খুন, হত্যা, বিষ্ফোরক দ্রব্য আইন, রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকান্ড প্রভৃতিতে শিশুদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের ক্ষেত্রে শিশুর বয়স নির্ধারণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে। শিশু আইনে এগুলো অন্তর্ভূক্ত হতে হবে।

* অভিযোগ আনার সুবিধার জন্য পুলিশ শিশুদের বয়স বাড়িয়ে দেখায় যার ফলে শিশু হিসেবে তার অধিকারকে অস্বীকার করা হয। বয়সসীমা যদি ১৮তে স্থির করা হয় তাহলে এ সমস্যার একটি সমাধান হওয়া সম্ভব। শিশুদের যথার্থ বয়স নিরুপনের জন্য জন্ম নিবন্ধনের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

* কিছু কিছু প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতি লক্ষ করা যাচ্ছে এ অবস্থায় শিশুরা আদালতে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আইনী সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে। একজন শিশুর মামলাটি যদি একজন ভালো ও দক্ষ আইনজীবী পরিচলান করনে তাহলে শিশুটিকে অন্তত কারাগারে না পাঠিয়ে রিমান্ড হোমে পাঠানো হবে।

* থানায় পুলিশের হেফাজতে থাকা অবস্থায় শিশুদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা কররার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা খুবই কঠিন। তবে নির্যাতনের ফলে শিশুদের ওপর যে প্রভাব পড়ে সে বিষয়ে পুলিশদের বুঝানে যেতে পারে যেনো তারা নিশ্চিত না হয়ে কোন শিশুর ওপর নির্যাতন না করে। সবচেয়ে ভালো হবে একটি সতর্কদৃষ্টি সম্পন্ন কর্তৃপক্ষের ও পুলিশের সমন্বয়ে একটি মানবিকীকরণ প্রচারণা চলানো।

* যেহেতু কারাগারে শিশুর সংখ্যা কম সেহেতু তাদের সুযোগ সুবিধা ভালোভাবে দেখে এবং তাদেরকে যেনো যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করা হয় তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে শিশু অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। কেননা শিশুদের ক্ষেত্রে এসব কিছু হচ্ছে আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব।

* সরকারি কর্মকর্তা, স্বনামধন্য ব্যক্তি, গণমাধ্যম, উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও শিশুরেদ সমন্বয়ে কারগার ও সংশোধনী কেন্দ্রে বন্দি শিশুদের সমন্বয়ে একটি 'রিভিউ কমিটি' গঠন করা যেতে পারে। এরা কারাগারের পরিস্থিতি নিয়ে মাসে একবার সভা করবেন। এতে পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

* কারাগার ও থানায় আটক শিশুর সম্পর্কে প্রতিবেদন দেওয়া আবশ্যক করতে হবে। এটা শিশুদের নির্যাতন ও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের মিথ্যা মামলা দায়ের নিরুৎসাহিত করবে।

* শিশু অধিকার সনদ, কিশোর বিচার ব্যবস্থা এবং আনুষাঙ্গিক আইনের প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে পুলিশ, বিচারক এবং সংশোধন কেন্দ্রে কর্মকর্তাদের ধারণা দেওয়ার কর্মসূচী নিশ্চিত করতে হবে।

* উন্নয়নের অর্থ দিয়ে সংশোধন কেন্দ্র গুলোর উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট লক্ষ স্থির করে সহযোগী পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। কারাগার ও সংশোধনী কেন্দ্রের শিশুদের অবস্থার উন্নতির জন্য সাধারণ সুপারিশমালার দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

* শুধু দোষী সাব্যস্ত হলেই নয়, তাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও কিশোর ছেলেরা আইনের সংস্পর্শে আসে। এটা আরও বেশি সত্য হয়ে ওঠে যদি তারা পতে বাস করে অথবা কর্মরত হয়। গ্রেপ্তাররের সময় তাদের সঙ্গে পুলিশের প্রথম যোগাযোগ ঘটে। এরপর তারা একটি প্রক্রিয়ার অন্তর্গত হয়, যার ফলে তাদেরকে লক-আপ আটকে থাকতে, কোর্টে শুনানি ও বিচারের জন্য হাজিরা দিতে অথবা বাংলাদেশের কোন এক সংশোধনী প্রতিষ্ঠান, ভবঘুরে কেন্দ্র বা জেলে দীর্ঘকালের জন্য আটক থাকতে হতে পারে। সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে সচেতন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

* আইন ব্যবস্থার অধীন ছেলেরা যে ধরনের কিশোর বিচার ব্যবস্তা পায় তা আর্ন্তজাতিক মানবাধিকারের মাপকাটি লঙ্ঘন করে। ছেলেরা অনেক সময় অযৌক্তিক কারণে গ্রেপ্তার হয় এবং মামলার আগে ও পরে গতানুগতিক ভিত্তিতে আটক থাকে। বিভিন্ন কারণে তারা ন্যায্য বিচারের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং আটক থাকাকালে তাদের খাবার, গোসল, মল-মূত্র ত্যাগ, গুমানো ও চিকিৎসার ব্যবস্থা খুবই শোচনীয়। পুলিশ ও তারা যে প্রতিষ্ঠানে থাকে সেখানকার অন্যান্য বাসিন্দা ও কর্মীদের দ্বারাও ছেলোর নির্যাতিত হয়। দক্ষ প্রশিক্ষনের অভাবেই সংশোধনী প্রতিষ্ঠান বা ভবঘুরে আবাস তাদের ঘোষিত পুনর্বাসনের উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম হয় না। অতএব এ ব্যাপারে সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে আরও বেশি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও নজরদারীর ব্যবস্থা করতে হবে।

* এমন একটি সংশোধন কার্যক্রম চালূ করতে হবে যার দ্বারা প্রত্যেক কিশোর অপরাধীদেরকে তাদের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদার ভিত্তিতে সেবা প্রদান করা সম্ভব হয। প্রত্যেক কিশোর কারাবন্দীর সংশোধন ও পুনঃসমাজভূক্ত করণের লক্ষ্যে কারিগরী, প্রাতিষ্ঠানিক ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণ সুলভ করতে হবে। প্রত্যেক বন্দীর ভিন্ন ভিন্ন চাহিদার ভিত্তিতে সংশোধন পদ্ধতি নির্ণয় (ডায়াগনেসিস) অত্যাবশ্যক। সুনির্দিষ্ট সমস্যা সমূহের ডায়াগনোসিসের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এরূপ একটি সংশোধন কর্মসূচীতে মনস্ত াত্বিক, মনোচিকিৎসা ভিত্তিক ও সমাজবিদ্যা বিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কিশোর অপরাধীদের শ্রেণিভূক্ত করার উপযোগী আধুনিক কৌশল যুক্ত করতে হবে। একজন মনস্তত্ববিধ, একজন মনোচিকিৎসক এবং টেকনিক্যাল ও মেডিকেল কর্মচারী নিয়ে একটি "শ্রেণীভূক্তকরণ বোর্ড" গঠন করা যেতে পারে।

* লিঙ্গ, কয়েদ কাল, শাস্তির ধরন, অপরাধ প্রবণতার মাত্রা এবং শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য অনুযায়ী অপরাধীদের শ্রেণীভূক্ত করতে হবে।

*কারিগরী প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা, রোগ নিরাময় সংক্রান্ত চিকিৎসা, মানসিক বা শারিরীক সমস্যাগ্রস্থদের পুনর্বাসন ইত্যাদির ভিত্তিতে ব্যক্তিগত চাহিদা পূরনের লক্ষে অপরাধীদের প্রতি যথাযোগ্য আচরণ করা হবে।

* বিভিন্ন বয়স সীমার জনগণ কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের প্রকৃতি ও সংখ্যা, অপরাধীদের মানসিক চিত্র, (Mental Profile) কিশোর অপরাধ, তদন্ত কৌশল এবঙ আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের উপর অন্যান্য দেশে গৃহীত আধুনিক গবেষণাগারের অনুরূপ প্রক্রিয়া হাতে নিতে হবে। সংশোধন কেন্দ্রের কর্মচারী ও তৎসংশ্লিষ্ট পুলিশের প্রশিক্ষণ এবং তাদের যোগ্যতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশোধনকে প্রাধান্য দিতে হবে।

* সংশোধন, বিশেষতঃ আমাদের কারাগারে ব্যক্তি নিরাপত্তা সম্পৃক্ত কারা সংশোধনের বিষয়টি বোধগম্যভাবে কঠিন। তবুও কারা ব্যবস্থা ও সংশোধন কেন্দ্রের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারী এজেন্সীসমূহের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটি সম্ভব হতে পারে।

* কিশোরদের লেখাপড়ার জন্য ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে ১০ শ্রেণী পর্যন্ত অনুমোদিত শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এজন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

*কিশোর অপরাধ, কিশোরদের সংশোধণ, সংশোধনী প্রতিষ্ঠান এ সম্পর্কে জনগন তেমন সচেতন নয়। কিশোর অপরাধ রোধের জন্য সংশোধনের চেয়ে পরিবার ও সমাজের সচেতনতা সৃষ্টি অধিক প্রয়োজন। এজন্য এ ব্যাপারে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৯.৪ উপসংহার :

শিশুরা দেশ ও জাতির আগামী দিনের দর্পণ ও আলোকবর্তিকা। তাদের উপর নির্ভর করে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় ও মানবকল্যাণ চিন্তা চেতনায় শিশু কিশোরদের অপরাধপ্রবণতা বা অপরাধজগতের করাল গ্রাস হতে রক্ষায় মানব সম্পদে রূপান্তরিত করার বিষয়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপি যে প্রয়াস, আমাদের মত একটি উন্নয়নশীল জাতির জন্য তা একটি অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক ও সম্ভাবনাময় পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। দেশ ও জাতির কর্ণধার হিসেবে বিবেচিত কিশোরদের সুস্থ্য স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে না পারলে এবং তাদেরকে স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারলে ভবিষ্যত প্রজন্ম চরম হুমকি ও সংকটের মুখে পতিত হবে। একারণে কিশোরদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া উচিৎ। এক্ষেত্রে পারিবারিক প্রাথমিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় শিশুর শারিরীক ও মানসিক বিকাশ সাধন অত্যন্ত শক্তিশালী হতে হবে। তাছাড়া সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে বোধ শক্তি জাগ্রত করতে হবে। যদি শিশুদের সমন্বিত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা যায়। তাহলে তারাই একদিন সমাজের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দায়িত্বগ্রহণ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু নানা কারণে এদের একটি অংশ আজ বিপথগামী। যদি এদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা না যায় তাহলে বর্তমান সভ্যতা ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়াবে।

তাই সমাজকর্মী, সমাজবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে এদিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে অবশ্যই আন্তরিক হতে হবে। যেন, আর কোন শিশু-কিশোর তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত না হয। পাশাপাশি সরকারকে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয় ঘটাতে হবে, কিশোর অপরাধ দমনে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শিশু কিশোরদের মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, গঠনমূলক চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। অপসংস্কৃতি অনুপ্রবেশ রোধ করতে হবে এবং অনুকরনীয় সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি ও সংরক্ষণে সরকারের পাশাপাশি সর্বস্তরের জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশে সকল পর্যায়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র উপদেষ্ঠা এবং মনোবিজ্ঞানী নিয়োগদানের ব্যবস্থা করতে হবে, যারা কাউন্সিলিং-এ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এছাড়াও এক্ষেত্রে পারিবারিক পরিবেশ অত্যন্ত যত্নশীল হয়ে কিশোরদেরকে সুশিক্ষায় বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা ও সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। পরিবার ও বিদ্যালয়ে অন্তরঙ্গ সৌহার্দপূর্ণ সর্ম্পক সৃষ্টি করতে হবে। শিশু কিশোরদের সঠিক যত্ন ও পরিচর্যা করে আমাদের তৈরী করা হবে। শিশুরা যেন সব রকম সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই একটি শিশু অপরাধী না হয়ে সমাজের একজন দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। শিশুদের সর্বদা পড়ালেখা, খেলাধুলা, লাইব্রেরী, শরীর চর্চা, স্কাউটিং, সৃজনশীল গঠনমূলক কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে। এলাকা ভিত্তিক বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাড়াতে হবে। দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠে সেটা দেখা আমাদের দায়িত্ব।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট -১ঃ গ্রন্থপঞ্জি

১. অধিকার, সেভ দ্যা চিলড্রেন (২০০১), কারাগারে আমাদের শিশুরা, ঢাকা ।

২. আখতার তাহমিনা ও ফারুক মুহাম্মদ (২০০৭), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঢাকা ।

৩. আহম্মেদ সালাউদ্দিন (১৯৮৬)- অপরাধ সমস্যা নিয়ন্ত্রণ ও পুলিশ, হাক্কানী পাবলিকেসন্স ।

৪. আফসার এম উদ্দীন (১৯৯৮) সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও অপরাধ, ভোরের কাগজ ০৮.০৩.৯৮ ।

৫. ইউ এন ডিপি, বাংলাদেশে ব্যক্তি নিরাপত্তা সেপ্টে: ২০০২, ঢাকা ।

৬. ইসলাম ড. নূরুল- সামাজিক গবেষণা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল- ২০০৭, তাসমিয়া পাবলিকেশন্সস, বাংলাবাজার, ঢাকা ।

৭. করিম নাজমুল (১৯৭২), সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ, বাংলাবাজার, ঢাকা ।

৮. খান বোরহান উদ্দিন (১৯৮৯)- অপরাধ বিজ্ঞান পরিচিতি, প্রথম প্রকাশ- ১৯৮৬, প্রভাতী প্রকাশনী ।

৯. খান ডঃ মোঃ মাইনুল আহমেদ- অপরাধ বিজ্ঞান মনোরোগ ও আইনের শাসন, আগষ্ট-১৯৯৮, মুক্তি চিন্তা প্রকাশন । আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা ।

১০. প্রবেশন অব অফেন্ডারস অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০ (১৯৬৪ সালে সংশোধিত), সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা ।

১১. জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ইউনিসেফ, বাংলাদেশ ।

১২. গাজী শামসুর রহমান - অপরাধ বিদ্যা, প্রকাশকাল- মে, ১৯৮৯ ইং, পল্লব পাবলিসার্স, বাংলা বাজার, ঢাকা ।

১৩. সাদেক ড. মোহাম্মদ (১৯৮৯)- অপরাধ ও সংশোধন, কল্লোল প্রকাশনী ।

১৪. সালাম মোহাম্মদ আব্দুস (১৯৯৭)- অপরাধ সংশোধনীমূলক প্রবেশন এবং মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীর

১৫. সংশোধনমূলক কার্যক্রম, প্রথম প্রকাশ আগষ্ট- ১৯৮৯, আলীগড় লাইব্রেরী, বাংলাবাজার, ঢাকা ।

১৬. সরকার আব্দুল হাকিম- অপরাধ বিজ্ঞান-তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ, প্রথম প্রকাশ- মে, ২০০৫, কল্লোল প্রকাশনী ।

১৭. সরকার প্রফুল্ল সি. উত্তম কে. দাস ও অনিমা আর নাথ (২০০১), সামাজিক কার্যক্রম, সমাজ সংস্কার ও সামাজিক আইন, ঢাকেশ্বরী, ঢাকা ও সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিসার্স, রাজশাহী ।

১৮. হোসেন হামজা (১৯৫৪), অপরাধ বিজ্ঞান, মুক্তধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা ।

১৯. হোসেন মোঃ আনোয়ার (২০০২), সামাজিক বিজ্ঞান জার্নাল রা: বি: ৭ম সংখ্য ।

২০. শিশু আইন (১৯৭৪), নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।

২১. শিশু বিধি (১৯৭৬), নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।

২২. আহমদুল্লাহ মিয়া ও এসএস এম আতীকুর রহমান, কিশোর অপরাধ সংশোধনী প্রতিষ্ঠান থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত কিশোরদের বর্তমান অবস্থার উপর জরিপ । ঢাকা সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮, পৃ. ৬ ।

২৩. মোহাম্মাদ হাবিবুর রহমান, আত্মহত্যায় আর্থ সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিককারণ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

২৪. এডভোকেট সাহিদা বেগম, পতিতা আইন (The suppression of Immoral traffic Act, ১৯৩৩) খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০০৫ ।

২৫. বেবী মওদুধ সম্পদিত, দেহ ব্যবসায় বাধ্য কিশোরীরা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রকাশিত, অক্টেবর, ১৯৯২ ।

২৬. মো: সিদ্দিকুর রহমান ও মো: শাওকাত ফারুক, শিক্ষা ব্যবস্থা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, মে, ১৯৯৮ ।

২৭. ভক্তি প্রসাদ মল্লিক, অরপরাধ জগতের ভাষা ও শব্দকোষ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩ ।

২৮. সিডি আই জার্নাল, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯২, শন্তিবাগ, ঢাকা ।

২৯. আলী ইবনে আবি তালিব, নাহজ আল বালাঘা র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০০ ।

৩০. আনু মাহমুদ, বাজেট : পরিকল্পনা-দারিদ্রবিমোচন, হক্কানী পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮

৩১. তথ্য সংগ্রহ, কিশোর সংশোধন প্রতিষ্ঠান, গাজীপুর, ঢাকা- ২০১২ ইং ।

৩২. হাসান ,ইমাম মুহাম্মদ, সামাজিক গবেষণা প্রত্যয় প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি, অধুনা প্রকাশনা, ৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা ।

৩৩. করিম ড. এ.কে নাজমূল, সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ৫ বাংলাবাজার, ঢাকা

৩৪. রহমান মোঃ লুৎফর , এ.কে. এম. শওকত আলী খান (২০০৯), গবেষণা পদ্ধতি ও মনোগ্রাফ, ২৬ বাংলাবাজার, ঢাকা ।

৩৫. সমাজসেবা অধিদপ্তর (সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়) কর্তৃক প্রকাশিত- বাংলাদেশে কিশোরদের বিচার ব্যবস্থা ও সংশোধনী কার্যক্রম, প্রকাশ ডিসেম্বর- ২০০২, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা ।

৩৬. সুলতানা প্রফে: রেবেকা, সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা, কল্লোল প্রকাশনী, নীলক্ষেত, ঢাকা ।

৩৭. Afsaruddin M. (1965), Juvenile Delinquency is East Pakistan, Social Science Research Project, Dhaka.

৩৮. Ahmad Siddique (1983), Criminology: Problem and Perspectives, Eastern Book Company, Luchnow 2nd Edition.BNWRA, Study on women prisoners of Bangladesh, Dhaka.

৩৯. Cavan Ruth Shonle, Ibid.Delinquency (1958), The Journal of Social Issues.

৪০. Dr. Sarker A. Hakim and Nurul Md. Islam, Juvenile Delinquency: A Simple Typological Analysis, The Journal of Social Development, Vol. 12.

৪১. Dutt-Gupta, Bela (1964), Contemporary Social Problems in India.

৪২. James Koutrelakos (1971), Perceptual & Motor skills.

৪৩. Juvenile Court Statistic (1966), Children's Bureau Statistical Services, 90, Children's Bureau, Washington D.C, 1967 (as referred by R.S. Cavan, Ibid,)

৪৪. Juvenile Delinquency: Dhaka City Experience-Professor Dr. Abdul Hakim Sarkar, University of Dhaka.

৪৫. Kog Nords, (1950) Analyzing Social Problems, The Dryden Press, New York.

৪৬. Legins, Peter, (1958), Pragmatic Etiology of Deliquent Behavior' Social forces, Vol.29.

৪৭. Miller, Walter B, (1971),, Lower Class Culture as a Generating Milieu of Gang

৪৮. Practice and Theory of Probation & Parole-David Dressler.

৪৯ ।Ruth Shonle Cavan (1959), Juvenile Delinquence- Development, Treatment. Control, Second edition, J.B.Lippincott Company New York.

৫০. S.Glueck & E.Glueck (1968), Delinquent & None Delinquent in Perspective,

৫২. Salahuddin Ahmed (1966), Studies in Juvenile Delinqulncy and Crime in East Pakistan, College of Social Welfare & Research Center, Dhaka.

৫৩. Thrasher, Fredric M, (1950) The boys Club and Juvenile Delinquence', American Journal of Sociology.

৫৪. United Nations, (1953) Comparative Survey on Juvenile Delinquency, Part IV, Asia and the Far East, New York.

৫৫. Unicef (2005), International Instruments of Juvenile Justice and Non custodial Measures.

৫৬. Morales A. Yvonne F. AndP.R. Munford. The Juvenile Justice System and Minorities. Social Work, Boston: Allyn and Bacon INC, 1986. p.397-3.

৫৭. Tappa Paul, Juvenile Deliquency. Newyork: Mc Graw Hill Book Company, INC. 1949. p.17.

৫৮. Ahmed, Salahuddin. Studies in Juvenile Delinquency and Crime in East Pakistan. Dhaka: College of Social Welfare and Reseach Center. 1966. p.9.

৫৯. Mia Ahmadullah. Criminal, Propensity of Youth: Prevention and Suppression. The Detective. Vol. 11 No. 1, January 12, 1988, Dhaka, PP. 4647.
৬০. See. Ahmadullah A.K. Social Factors of Jvenile Offence in East Pakistan, College of Social Welfare and Rescarch Center, 1964.
৬১. Juvenile Deliquency in East Pakistan. Social Science Research Project. Dhaka University, 1965.
৬২. Govt. of Bangladesh. The Children Act No xxxix of 1974; Rules vide notification date 11 March 1976 framed uner the Children Rulce 1976.
৬৩. Mohammad Afsaruddin, Juvenile Delinquency in Banngladesh, D.U., 1993.
৬৪. Kelvin Seifert & Robert J. Hoffnung, Child and Adolescent Development.
৬৫. Zaria Rahman Khan & H.K. Arefeen, The Situation of Child Prostitutes in Bangldesh,Centre for Social Studies, Dhaka, 1990.
৬৬. Understanding Your School-Age Child, Alexandaria, Virginia.
৬৭. বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন পত্রিকা, সাময়িকী ইত্যাদি

পরিশিষ্ট -২ঃ প্রশ্নমালা

বাংলাদেশ কিশোর অপরাধ পরিস্থিতি : মুন্সীগঞ্জ শহরের উপর একটি সমীক্ষা
(সংগৃহীত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হবে এবং যাবতীয় গোপনীয়তা সংরক্ষণ করা হবে)
(কিশোর অপরাধীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

ক. কিশোর অপরাধীর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও বাসস্থান সম্পর্কিত তথ্য :

১.উত্তরদাতার নাম : .....
২.বয়স : ..... বছর
৩.পিতার নাম : .....
৪.মাতার নাম : .....
৫.লিঙ্গ :
* পুরুষ
* মহিলা
৬.ধর্ম :
* ইসলাম
*হিন্দু
* বৌদ্ধ
* খ্রিষ্টান
*অন্যান্য
৭.বৈাহিক অবস্থা :
* বিবাহিত
*অবিবাহিত
*তালাকপ্রাপ্ত
* বিচ্ছিন্ন
* অন্যান্য
৮.বর্তমান ঠিকানা :
পাড়া/মহল্লা .....থানা.....জেলা.....মোবাইল (যদি থাকে):.....

৯.স্থায়ী ঠিকানা :
পাড়া/মহল্লা.....থানা.....জেলা..... মোবাইল (যদি থাকে):.....
১০. জন্মগত ভাবে মুন্সীগঞ্জ শহরে থাকেন, না গ্রাম বা অন্য শহর থেকে আগত

- জন্মগতভাবে মুন্সীগঞ্জে থাকি * গ্রাম বা অন্য শহর থেকে এসেছি

১১.গ্রাম বা অন্য শহর থেকে আসলে আসার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)

* প্রকট দারিদ্র
*প্রাকৃতিক দুর্যোগ
*গ্রামীণ দ্বন্দ্ব
* পিতা-মাতার তালাক
* পারিবারিক নিরাপত্তহীনতা
* সঙ্গদোষ
* অপরাধ
*পলাতক
*ঘৃনা

১২. আপনার পিতা বা পরিবারের প্রধান বর্তমানে কোন ধারনের পেশায় জড়িত ?
চাকুরী/ব্যবসা/ডাক্তার/শিক্ষকতা/অন্যান্য
১৩. আপনার পিতার মাসিক আয় কত ?
১৪. পারিবারিক তথ্য :

ক্রঃ নং	নাম	বয়স	লিঙ্গ	উত্তরদাতার সাথে সর্ম্পক	শিক্ষা	পেশা	মাসিক আয়

১৫. আপনি কি নিজের বাড়িতে থাকেন?
* হ্যাঁ
* না
১৬. পরিবারের ধরণ:
*একক
*যৌথ
১৭.বাসস্থানের ধরণ
*কাচা
*পাকা
*আধা পাকা
১৮.আপনার বাসস্থানের কক্ষ সংখ্যা কত ?
১৯.আপনার বাড়িতে বিদ্যুত আছে কী ?
* হ্যাঁ
* না
২০. বিদ্যু থাকলে কত সময় থাকে?
সবসময়/মাঝেমাঝে/কম থাকে

২১. আপনি কী টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করেন ?
* হ্যাঁ
* না

২২. টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার না করলে কিসের পানি ব্যবহার করেন ?
* নদী
*পুকুর
*খাল
* অন্যান্য
২৩. আপনার বাড়িতে বিনোদনের ব্যবস্থা আছে কী?
২৪. বাড়িতে কী কী বিনোদন ব্যবস্থা আছে?
টিভি/খেলাধুলা/বইপড়া/গল্প বলা/ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন

অপরাধ সংক্রান্ত ও অন্যান্য তথ্যাবলী

২৫. আপনি কোন অপরাধের সাথে যুক্ত কীনা ?
* হ্যাঁ *না
২৬. আপনি যে ধরনের কাজের সাথে যুক্ত তার নাম বলুন ?
২৭. আপনি কোন অপরাধী সম্পর্কে জানেন কীনা বলুন ?
* হ্যাঁ *না
২৮. জানলে তারা কোন ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত ?
২৯. রাজনৈতিক নাশকতা কাজে অংশ গ্রহণ করেন কিনা?
হ্যাঁ/না
৩০. আপনার বন্ধুদের মধ্যে কেউ নেশা করে কিনা?
হ্যাঁ/না
৩১. কি নেশা করে?
গাজা/হেরোইন/ফেনসিডিল/ইয়াবা/ধূমপান/মদ/অন্যান্য
৩২. আপনি নেশা করেন ?
হ্যাঁ/না
৩৩. নেশা করে থাকলে বিষয়টি কি আপনার পরিবার জানে?
হ্যাঁ/না
৩৪. আপনি অপরাধের কারণে কোন সাজা পেয়েছেন কিনা ?
* হ্যাঁ * না
৩৫. সাজা পেলে কত সময় ?
বছর/মাস
৩৬. আপনি কত দিন যাবত জেল থেকে ফেরত এসেছেন ?
.....মাস .....দিন
৩৭. বর্তমানে আপনি কী করছেন ?
* লোখাপড়া

* কাজে নিযুক্ত
*বেকার
* অন্যান্য

৩৮. অপনার জানা মতে কিশোররা কেন অপরাধ করে
* আর্থিক সুবিধার জন্য
*অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে
* ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দেখানোর জন্য
* শখ বশত

৩৯. কিশোররা অপরাধের সাথে যুক্ত থাকার কারণে সমাজে কী কী সমস্যা দেখা দেয় বলে আপনি মনে করেণ –
*বিশৃঙ্খলা
*আইনের প্রতি অবজ্ঞা
*সন্ত্রাস
*আর্থিক দৈন্যতা
*মানব সম্পদ অপচয়

৪০.আপনি কী কখনও আপনার অপরাধের জন্য প্রবেশন কর্মকর্তার কাছে গিয়েছেন ?
*হ্যা * না

৪১.গিয়ে থাকলে আপনাকে কী উপদেশ দিয়েছে ?

৪২. কিভাবে আপনি আপনার অপরাধমূলক অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেন ?
* লেখাপড়ার মাধ্যমে
*ধর্মীয় চর্চার মাধ্যমে
* সিনিয়ারদের উপদেশ শুনে
* খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করে
* অণ্যান্য

৪৩. জেল থেকে ছাড়ার পর এ পর্যন্ত কোন অপরাধ করেছেন কী ?
*হ্যাঁ * না

৪৪.অপরাধ করলে সেটি উল্লেখ করুন –

৪৫ .আপনার জানামতে সমাজের লোকেরা অপরাধকে কিভাবে দেখে ?
* খুব খারাপ দৃষ্টিতে
*মোটামুটি খারাপ দৃষ্টিতে
* খারাপ দৃষ্টিতে
*ভালো দৃষ্টিতে

৪৬. অপরাধ থেকে মুক্ত হবার জন্য পরিবারের কোন সমদ্য নিয়মিত উপদেশ দেন -
* বাবা *মা *ভাই *ভাবী *বোন *অন্যকেউ

৪৭. আপনার দৃষ্টিতে অপরাধ মানুষ মূলত কোন কারণে করে ?
*দারিদ্র * বেকারত্ব *খারাপ সঙ্গ *হতাশা গ্রস্থতা

৪৮. আপনার অপরাধ প্রবণতা সমাজে কি কি ক্ষতি বয়ে আনে?

- যুব সমাজের নৈতিক অধপতন
- হতাশা গ্রস্থতা

- দারিদ্র্যের সংখ্যা বৃদ্ধি
- সামাজিক বিশৃঙ্খলা
- সামাজিক হেয়প্রতিপন্ন
- যুব সমাজের উন্নতির পথ বন্ধ

৪৯. কিশোর অপরাধ সংশোধন সম্পর্কে জানা আছে কি?
হ্যাঁ/না
৫০. উত্তর হ্যাঁ হলে কি কি সংশোধন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানেন?
প্রবেশন/প্যারোল/পূর্ণবাসন/অন্যান্য
৫১. কিশোর অপরাধ সংশোধনে তোমার সুপারিশ দাও ।
১ ।
২ ।
৩ ।
৪ ।
৫ ।

ধৈয্য সহকারে উত্তর দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

নিরীক্ষকের স্বাক্ষর
.....

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর
.....

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট -৩ঃ গবেষণা এলাকার মানচিত্র

চিত্র : গবেষণা এলাকা